# প্রবাসের জীবন

আব্দুল হামীদ



## মুখবন্ধ

মুসলিম পরিবার ও সমাজের দুরবস্থার কথা লিখতে মন হয়, সে লেখাতে সংস্কার থাকে। নিয়ত ভাল থাকলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রবাস-জীবনের বহু কাহিনী থাকে। এই পুস্তিকায় প্রবাসীদের একটা চিত্র অঙ্কন করতে প্রয়াস চালানো হয়েছে। কোন কোন চরিত্রে কোন কোন ব্যক্তির সাথে মিল থাকলেও কাহিনীটি কিন্তু বাস্তবভিত্তিক কাল্পনিক।

এই শ্রেণীর কাহিনীতে নেতিবাচক দিকও থাকতে পারে। তবে যদি আমাদের যুবকেরা কেবল ইতিবাচক দিকটা গ্রহণ ক'রে নেতিবাচক দিকটাকে ফলের ছালের মতো ডাস্‌বিনে ফেলে দিতে পারে, তাহলে অবশ্যই উপকৃত হতে পারবে।

আমি সেই উপকারের আশাতেই কী-বোর্ডের বটন টিপছি। আমার বন্ধুদের সুদৃঢ় ধারণা, আমার সে আশা পূরণ হবে।

বিনীত---

*আব্দুল হামীদ*

আল-মাজমাআহ

সউদী আরব

৩০/ ১১/২০১০

## (১)

আলেম-ফাযেল পাশ ক'রে মুনীরুয্ যামান বাড়িতে বসেই ছিল। চাকরির খোঁজ করেছে, চাকরি করেছেও; কিন্তু তাতে মন বসেনি। যেহেতু ঃ-

এক ঃ বেতন কম, তাতে সংসার চলে না। ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো যায় না।

দুই ঃ মাদ্রাসার চাকরিতে মাদ্রাসার জন্য আদায় করতে হয়। আর আদায় করার কাজ বেশ ভাল ঠেকায় না।

তিন ঃ মসজিদের চাকরিতে গুঁতুনি খেতে হয় খুব বেশি। দশের কাজে দশ মাথায় কথা বলে, আর তা সহ্য করা বড় কঠিন।

সুতরাং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সে পশ্চিমে পাড়ি দিল। বোম্বাইয়ে এসে কাজের সন্ধান চলতে লাগল। কোন ভাল কাজ পাওয়ার আগে সে কিছু পরিচিতজনদের নিকট থেকে টিউশনির প্রস্তাব পেল। কিছু বাংলা ও কিছু উর্দুভাষী ছেলে-মেয়েদেরকে সে টিউশনি পড়াতে লাগল।

এই শ্রেণীর টিউশনিতে কিশোরীদের সাথে অবৈধ নির্জনতা ঘটে, যা অভাবী টিউটর বাধ্য হয়ে অগ্রাহ্য করলেও অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রীর পরিবার বাধ্য না হয়েও সেই নির্জনতার সুযোগ সৃষ্টি করে। যেহেতু পৃথক খরচ ছাড়াই 'জামাই' চয়েস করার এটি একটি সফল পদ্ধতি।

বোম্বাইয়ে মুনীরের টিউশনির বাজার ভাল জমে উঠল। বিশেষ ক'রে নূরী নামক এক কিশোরীর অভিভাবকের তরফ থেকে সে বেশ উৎসাহ ও সহযোগিতা পেতে লাগল।



মুনীর ছিল অবিবাহিত। তার কুরআন পড়া ইত্যাদি ছিল মনোমুগ্ধকর। সুতরাং নূরী তো বটেই, তার আব্বা-আম্মাও মুনীরের আখলাক-চরিত্রে মোহিত ছিল।

মহান আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন, এইভাবেই তার কোন হিল্লে লাগিয়ে দেন। তাদের অবস্থা ছিল বিরাট। মালদহে দেশের বাড়িতেও তাদের অবস্থা ভাল। বোম্বাইয়ে একটা বড় ফ্লাট-বিল্ডিং-এর মালিক। সেই ফ্লাট-কমপ্লেক্সের একটি রুম তাকে থাকার জন্য ছেড়ে দিল এবং তার নিচে লিফ্টের কাছে তারা তাকে একটি মুদীখানাও খুলে দিল। সেই সাথে তাকে সঊদী আরব, কুয়েত বা দুবাই ইত্যাদি দেশে যাওয়ারও সন্ধান রাখতে থাকল।

অবশ্য নূরী ও তার আম্মা চায় না, মুনীর তাদেরকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাক। কিন্তু তার আব্বা বড় উন্নতিপ্রিয় মানুষ। মুনীরের উন্নতি হোক, এটা সে মনে-প্রাণে চায়।

বছর খানেক কাটার পর নূরীর পড়াশোনায় অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হল। যদিও সে বাংলা ও কুরআন পড়তে ভালভাবে শিখে গিয়েছিল, তবুও পড়তে বসে যেন তার আলাচালা মন। 'জনাবজী! আজ একটা গল্প শোনান, একটা গজল শোনান' বলে পড়াতে ফাঁকি দিতে চায়। বড় স্নেহের সাথে মুনীর তার আব্দার রক্ষা করে। লক্ষ্য করে, সে যেন তাকে ভালবেসে ফেলছে। যদিও ভালভাষা দিয়ে ভালবাসার ফাঁদ পেতে কাউকে ফাঁসাবার চেষ্টা সে করেনি। কিন্তু প্রেম এমনই জিনিস যে, তা করতে হয় না, আপনা-আপনিই হয়ে যায়।

মুনীর যেহেতু আলেম এবং আল্লাহর ভয় তার মধ্যে আছে, তাই সে বড় সতর্ক থেকে কালাতিপাত করে। নূরী যখন-তখন দোকানে এসে

উৎপাত করলে সে বাইরে চলে আসে। তাতে নূরী রাগে। কথার জবাব না পেলে রাগ দেখায়। মায়ের কাছে উল্টা ক'রে কিছু বললে মা আবার মুনীরকে ভর্ৎসনা করে! হয়তো বা এই জন্য যে, মুনীর তাদের জামাই হওয়ার উপযুক্ত।

ইতিপূর্বে মসজিদে চাকরি করার সময় এক কিশোরীর প্রেমে সে ধাক্কা খেয়েছে। মসজিদের ভিতরে বসে কুরআন হাতে রেখে কসম দিয়েছিল সেই কিশোরী, কিন্তু সে কসম মুনীরের জন্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আবারও সেই ভয়। বিশেষ ক'রে তার ইচ্ছা, কোন আধা-বাঙালী মেয়েকে সে জীবন-সঙ্গিনী করবে না। কারণ, স্বদেশী ও স্বভাষী তরুণীকে জীবন-সাথী বানিয়ে দাম্পত্যে ও আলাপে যে তৃপ্তি আছে, তা অন্য কোন তরুণীর মধ্যে নেই। অবশ্য শর্ত হল উভয়ের মন ও শিক্ষাগত মান এক হতে হবে। নচেৎ রসগোল্লায় ইঁদুর।

চুন খেয়ে গাল তেঁতেছে, এখন দই দেখলেও ভয় হয় মুনীরের। তাছাড়া আশ্রিতজন হয়ে বসবাস ক'রে সে আশ্রয়দাতার সর্বনাশ করতে পারে না। তার মন বলে, 'অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত, ক্ষুঁয়াতাঁতি হইয়া দাও তসরেতে হাত?' গোবুরে পোকার পদ্মমধু খেতে সাধ হলে কি সে সাধ মিটবে? যদি নূরীর বিত্তবান অভিভাবক রাযী না থাকে, তাহলে কেন সে তাকে ভালবেসে তাদের সংসারে অশান্তির আগুন প্রজ্বালিত করবে? অন্ততঃপক্ষে একজন আলেমের জন্য তো তা শোভা পায় না।

একদিন সন্ধ্যায় বড় খুশীর সাথে একটা উর্দু পেপার সহ দোকানে এল নূরীর আব্বা। মুনীরের সামনে পেশ ক'রে বলল, 'মৌলানা সাহেব! এই দেখুন, দুবাইয়ে একটি চাকরির সন্ধান আছে। আপনি



এই এলান সাথে ক'রে মদীনা এজেন্সীতে আজই যান। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে লেগে যাবে।'

দোকান বন্ধ ক'রে মুনীর পড়ি কি মরি হয়ে দৌড় দিল মেন রোডের দিকে। সেখান থেকে একটি অটো ভাড়া ক'রে পৌঁছে গেল এজেন্টের কাছে। খবর ভাল, তবে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা কারেন্ট জমা লাগবে। এতগুলো টাকা সে এক সাথে কোথায় পাবে?

ফিরে এল ফ্লাটে। লিফ্ট থেকে নেমেই নূরীর সাথে দেখা। আগেভাগে নূরী বলল, 'শুনলাম ভিসার সন্ধান পেয়েছেন। কী বলল এজেন্ট?'

---বলল, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা জমা লাগবে।

---আপনি কি সত্যই চলে যাবেন?

---তোমার কী ইচ্ছা?

---আমার ইচ্ছা, আপনি এখানেই থাকুন।

---চিরদিন তোমাদের বোঝা হয়ে থাকব নূরী? এই বোঝা তোমরা বহন করতে পারবে? জীবনে কি উন্নতির পথ সন্ধান করা দোষের বলছ? আমি বড় হই, তা কি তুমি চাও না?

---অবশ্যই। কিন্তু....।

---এর মাঝে আবার 'কিন্তু' কি? আমি শুনেছি, বড় মানুষদের বড় হওয়ার পিছনে কোন না কোন মহিলার হাত থাকে, তুমি সেই মহিলা হয়ে যাও নূরী!

---কী করতে হবে বলুন?

---আব্বাকে বলে বিশ হাজার টাকা যোগাড় ক'রে নিয়ে এসো। আমার কাছে দশ হাজার মত আছে। এজেন্টকে দিয়ে ভিসাটা হাতে ক'রে নিই।

---আমি চাই না, আপনি আমাদেরকে ছেড়ে বিদেশ যান। সুতরাং

আমি ওসব পারব না।

বলেই নূরী বাসায় প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিল!

নূরী ছোট মেয়ে। তার পাগলামিতে গেলে মুনীরের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে; ভাই-বোনদেরকে মানুষ করার স্বপ্ন, পিতামাতার সচ্ছল অবস্থা আনয়নের স্বপ্ন এবং নিজের বড় হওয়ার স্বপ্ন। সুতরাং সে সরাসরি সাহস ক'রে বুকে আশা নিয়ে নূরীর আব্বাকে টেলিফোন করল। সে মুনীরকে আশ্বাস দিল। কিন্তু সামনে মেয়ে নূরী সে কথা শুনে আব্বাকে টাকা দিতে নিষেধ ক'রে বলল, 'বিদেশী মানুষকে এতগুলি টাকা ধার দেবেন?'

---পাগলী! বিদেশী হলেও একজন আলেম যে।

নূরীর মানা করার কারণ আর কেউ না বুঝলেও তার মা বুঝল। মায়ের স্নেহে এ কথা ধরা পড়তে বাকী থাকল না যে, তার নূরী মুনীরকে ছাড়তে চায় না। কিন্তু মনের কথা সেও মনের মাঝেই রেখে দিল।

যথাসময়ে এজেন্টকে টাকা দিয়ে এল মুনীর। তারপর পাশপোর্টের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে আরও এক এজেন্টকে টাকা খাওয়াল। এ টাকার শহরে টাকাই হল খাদ্য। টাকা ছাড়া কোন সরকারী কাজও সহজে হয় না। টাকার অভাবে একটা স্বাভাবিক কাজও অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

সেদিন পড়ার সময় নূরী আরও বেশী অমনোযোগিতা প্রদর্শন করল। মুনীর বলল, 'নামাযে আমার জন্য দুআ করো নূরী! আমার চাকরিটা যেন হয়ে যায়। আমি প্রথম সফরে ফিরে আসার সময় তোমার জন্য একটা বড় উপহার নিয়ে আসব।'

নূরী হাসির ঝিলিক দিয়ে বলল, 'আমি আল্লাহর কাছে পাঁচ ওয়াক্ত দুআ করব, যাতে আপনার না যাওয়া হয়।'



---সে কি? তুমি তাহলে আমার শত্রু?

---না, পরম বন্ধু। আমি আপনার কাছে কাছে থাকতে চাই। ওয়াদা দিন, আপনি আমাকে দুবাই নিয়ে যাবেন?

---তুমি অন্য লাইনের কথাবার্তা বলছ নূরী! আব্বা-আম্মা শুনতে পেলে মহা বিপদ হয়ে যাবে। তাছাড়া তোমার বয়স এখন অল্প, তুমি বড় হও, পড়াশোনা ক'রে উচ্চ শিক্ষিতা হও.....।

---তারপর আমাকে নিয়ে যাবেন তো? এই কুরআন ছুঁয়ে বলুন।

সাথে সাথে কুরআন বাড়িয়ে দিল নূরী! হঠাৎ মুনীরের মনে পড়ে গেল পূর্বেকার সেই কুরআন স্পর্শ ক'রে অঙ্গীকার করার ঘটনা। অঙ্গীকারের পরেও সে আজ অন্যের সাথে সংসার করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং আবার সেই একই ভুল কি দ্বিতীয়বার করে?

মুনীর বলল, 'ছিঃ! কুরআন আল্লাহর সম্মানিত কালাম। এমন সামান্য বিষয়ে কসমের জন্য তা ব্যবহার করতে হয় না। বেশ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার কাঁধ যখন তোমাদের কাঁধ বরাবর হবে, তখন আমি তোমাকে দুবাই নিয়ে যাব। এখন পড়া ক'রে নাও।'

মুনীর সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়তে লাগল। নূরী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে চক্ষে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। কোন্ অজানা অব্যক্ত ব্যথায় তার বক্ষ টন্টন্ করছিল। কী হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তার মন শঙ্কিত ছিল। সে ওস্তাদের সাথে সাথে পড়ার পুনরুক্তি ঘটাতে পারল না। বরং ওড়নায় মুখ ঢেকে নীরব-নিথর পুতুলের মত বসে রইল।

এইভাবে যাদের প্রতিভা আছে, তারা কোন আকর্ষণে আসা প্রত্যেক তরুণীকে কাঁদাতে পারে। তারা নিজ ঘরে নিয়ে তাদের কান্না থামাতেও পারে। কিন্তু সে এমন এক ঘর, যেখানে একজনের বেশি প্রবেশ বড় কঠিন।

মুনীর নূরীকে ওয়াদা দিল বটে, কিন্তু মন তার গাইতে লাগল এবং সে লিখতেও লাগল,

দেখিলাম যারে প্রেমের নয়নে
প্রীতির পলক মেলে,
আসিবে সে কি মন-আঙিনায়
সন্দেহ হয় দেলে।
এ আসা তো সে আসা নহে
এ বাসা তো ভালবাসা নহে
বাধাহীন প্রবাহিনী
উচ্ছৃঙ্খল আগমনী
না, তাহাও নহে তবে?
ধমকে থমকে থেকে থেকে
চমকে কেঁপে এঁকে-বেঁকে
সে কি আসা, সে কি বাসা
নাকি শুধু পদধ্বনি?
আগন্তুক আসিতে চাহে
বাধা দানে কেহ
বিপদের কথা ভাবি',
বিপদও অজেয়।
তবে রুখ রাতুল চরণ যাতে
দুলে নাহি দলে মোর মন জমি,
নুপুর ঝঞ্জায় যায় বুঝি প্রাণ যায়
কাছে পাওয়ার আশাটুকু দমি।



## (২)

যথাসময়ে পাশপোর্ট হাতে এল। জমা দেওয়া হল এজেন্টের কাছে। এক সপ্তাহ পর দেখা করতে বলল তারা। দেখা করার সময় এজেন্সির মালিক বলল, 'আপনার ফাইলের দায়িত্বশীল ম্যানেজার হঠাৎ এক ইমার্জেন্সী কাজে দেশে গেছে। সে ফিরে আসা অবধি আপনি মেডিকেল ক'রে রাখুন, ভিসা লেগে যাবে।'

এজেন্টের কাছ থেকে এম্বেসীর কাগজ নিয়ে বড় খুশীর সাথে মুনীর মেডিকেল সেন্টারে গেল মেডিকেল চেক-আপ করতে। মেডিকেলে 'ফিট' রিপোর্ট নিয়ে জমা করার পরেও তার কাজ আটকে থাকল। কারণ, সেই দায়িত্বশীল ম্যানেজার এখনও ফেরেনি।

আজ-কাল ক'রে এক মাস পার হয়ে গেল, সে আর ফিরে এল না। সুতরাং মুনীরের ত্রিশ হাজার টাকা পানিতে ভেসে গেল।

এ খবরে কেউ খুশী হোক বা না-ই হোক, নূরী অত্যন্ত খুশী হয়েছিল। তবে ত্রিশ হাজার টাকা এবং তার মধ্যে তার আব্বার বিশ হাজার টাকা নষ্ট হওয়ায় তার অবশ্য দুঃখ হয়েছে।

একদিন পড়ার সময় উক্ত কথা আলোচনাকালে নূরী হেসে উঠলে মুনীরের চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বড় আবেগময় কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি ছোট মেয়ে, বড় লোকের মেয়ে। তুমি আমার দুঃখের কথা বুঝবে না নূরী!'

এ কথা শুনে নূরীও মনে মনে কষ্ট পেল। সাথে সাথে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'আপনি আমাকে বড়লোকের মেয়ে কেন বললেন? আমার

আব্বা বড়লোক হলেও আমি তো বড়লোক নই। আপনি কি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন না?'

---ছেলেমি করো না নূরী! আমার উন্নতির পথে তুমি এমন অন্তরায় হতে চাও কেন?

---আমি মনে-প্রাণে চাই যে, আপনি উন্নতির হিমালয়-শিখর জয় করুন। কিন্তু আপনার যে উন্নতিতে আমার ক্ষতি, তাতে আমার আনন্দ হবে কেন?

---মিথ্যা স্বপ্ন দেখো না নূরী! বাস্তবকে স্বীকার ক'রে বাঁচতে শিখো, সুখ পাবে।

নূরীর আব্বার কাছে এ দুঃসংবাদ পৌঁছলে সে মুনীরকে সান্ত্বনা দিল। উদার-চিত্তের মানুষের অনুগ্রহে সে নিজেকে সামলে নিতে অবকাশ পেল।

প্রায় এক মাস পর আবার চান্স্ এল সঊদিয়া যাবার। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ ক'রে ভিসা লেগে গেল। এতেও সহযোগিতা করল নূরীর আব্বা। খুশীর জোয়ারে ভাসতে ভাসতে মুনীর বাংলায় গিয়ে বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখা ক'রে এল।

উড়ানের আগের দিন বৈঠকখানায় নূরী কান্নাভিজা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি শেষে চলেই যাবেন। যেতে আর বাধা দেব না, দিতে পারি না। তবে আমার কথা যেন মনে থাকে।'

---অবশ্যই মনে রাখব নূরী! যাদের নুন খেয়েছি, তাদেরকে ভুলে যাওয়া কি এত সহজ?

---চোখ আড় কি পাহাড় আড়। তাছাড়া চোখাচোখি যতক্ষণ, সালামাল্কি ততক্ষণ। চোখে চোখ যতক্ষণ, প্রাণ পুড়ে ততক্ষণ।



---সে অন্য কারো হতে পারে, আমার নয়।

---ফোন করবেন মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, আপনি কী কাজে যাচ্ছেন, তা বললেন না তো?

---ওখানে গিয়ে যে কোন একটা কাজ দেখে নেব। কোন রকম গিয়ে পৌঁছি তো নবীর দেশে। আগে উমরাহ করব, তারপর কাজ।

---কী সৌভাগ্য আপনার। উড়ো জাহাজ চড়ে নবীর দেশে যাচ্ছেন। ভাবতেই আমার চোখে পানি চলে আসছে।

মুনীরের চোখ দু'টিও পানিতে ঝলমল ক'রে উঠল। নূরী তার আব্বার 'সঞ্চিতা' বইটি আলমারি থেকে পেড়ে নিয়ে নজরুলের 'বিদায়-বেলায়' কবিতা পাঠ করতে লাগল,

'তুমি অমন ক'রে গো বারে-বারে জল-ছলছল-চোখে চেয়ো না,  
জল-ছলছল-চোখে চেয়ো না,  
ঐ কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,  
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।।  
হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,  
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।  
ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ  
দেখি, আর শুধু হু-হু করে বুক!  
চলার তোমার বাকী পথটুক্---  
পথিক! ওগো, সুদূর পথের পথিক---  
হায়, অমন ক'রে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,  
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না।।......'

মুনীর বলতে লাগল,

যাইব আমি পথের পরে চাইব নাকো ফিরে,
মুছবে তুমি চোখের পানি আঁচল দিয়ে ধীরে।
তা'পর ঢুকিবে ঘর----
তোমার আমার শেষ দেখাতে হইব আমি পর।

নূরী বলল, 'কক্ষনও নয়।'

এমন সময় নূরীর আম্মা এসে বলল, 'সেই পাক মাটি থেকে আমাদের জন্য দুআ করো বাবা!'

---অবশ্যই করব। দুআ করব, আপনারা যেন হজ্জে আসতে পারেন।

---ইন শাআল্লাহ আমরা হজ্জে যাব।

পরের দিন বিদায় নিয়ে মুনীর এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হল। সঙ্গে গেল নূরীর আব্বা ও তার ছোট ভাই। সবার ডোর ছেঁড়া সহজ ছিল, কিন্তু নূরীর ডোর ছেঁড়া সহজ ছিল না। কারণ, তার ডোর ছিল প্রেম-ডোর, যা সকল ডোর অপেক্ষা বেশী মজুবত।

এয়ারপোর্টে বোর্ডিং-পাশ নেওয়ার জন্য লাইনে খাড়া হল। এক সময় অফিসারের কাছে এলে সে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। পাশপোর্টটা উলট-পালট ক'রে দেখে পরীক্ষা করল। দাড়ি দেখে সন্দেহ হল, বাংলাদেশী নয় তো? পাশপোর্টটা নকল নয় তো? সন্ত্রাসী নয় তো?

একজন পাশ থেকে ব্যঙ্গ ক'রে বলল, 'লাদেন চাচ্চা।'

অবশেষে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এক সময় প্লেনে এসে হাঁফ ছেড়ে বসল।



## (৩)

দেশ-দেশান্তর ও আরব সাগর পাড়ি দিয়ে উড়তে উড়তে পৌঁছে গেল নবীর দেশে, রিয়ায এয়ারপোর্টে। প্লেনে বসে সাদা মেঘের উপরে নীল আসমানের নিচে বসে সে কত কী ভাবছিল। নূরীর কথা তো সে ভাববেই। যেহেতু এ জীবনে আসল ভাবনা তারই, যদিও সে তাকে জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার আশা করে না।

ভাবছিল চাকরির কথা, কী চাকরি হবে? কত বেতন পাবে? যদিও এজেন্ট বলেছে, 'ভাল চাকরি। খাবার ফ্রি। বেতন আট শ' রিয়াল, মানে প্রায় ১০ হাজার টাকা। ওভার টাইম করতে পারলে বাড়তি পয়সা আছে।' তবুও সে নতুন এক অচেনা-অজানা জায়গা। পরিবেশের লোকেরা কেমন হবে? এয়ারপোর্ট থেকে কী ভাবে চাকরিস্থলে পৌঁছবে? ইত্যাদি কথাও ভাবছিল।

সঙ্গে অবশ্য স্পনসরের টেলিফোন নম্বর আছে। আল্লাহ ভরসা।

প্লেন থেকে নেমে নিরাপত্তা ও ইসলামী পরিবেশের আশ্রয়ে আসার এক মহানন্দ অনুভব করল মুনীর। চলমান সিঁড়ি বেয়ে নেমে লাইন দিল এমিগ্রেশন চেক করার জন্য। পাশের এক লাইন হাল্কা থাকলে এক অফিসার ডেকে বলল, 'ইয়া রফীক্ব! তাআল ক্বিদ্দাম।'

নতুন মানুষ। সামনে এসে আদবের সাথে দাঁড়াল। আরবী জানে। কিন্তু 'রফীক্ব'-এর পারিভাষিক অর্থ সে বুঝল না। সে জানে 'রফীক্ব' মানে সাথী বা বন্ধু। কিন্তু এখানে যে তাকে অবজ্ঞা ক'রে 'রফীক্ব' বলা হচ্ছে, তা সে বহুদিন পরে বুঝেছিল।

কমপিউটারের সামনে আসতে অফিসার পাশপোর্ট নিয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কাইফা হালুকা ইয়া শায়খ?'

অফিসারের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গদগদ কণ্ঠে বলল, 'ত্বাইয়েব। আল-হামদু লিল্লাহ।'

চেক-পয়েন্ট পার হতেই এক অফিসার অন্য অফিসারকে মুনীরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে ব্যঙ্গচ্ছলে বলে উঠল, 'তালেবান!'

এখানে মুনীরের মনে ধাক্কা লাগল। ভাবল, অমুসলিম দেশের 'লাদেন চাচ্চা' আর মুসলিম দেশের 'তালেবান' বলার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কেন এই পার্থক্যহীনতা? কারণ একটাই, দাড়ি-ওয়ালাদের সন্ত্রাস।

এরপর এল কাস্টম অফিসারের চেকিং। সে ব্যাগটা খুলতে যা বলল, তা মুনীরের বুঝে এল না। সুতরাং ডিউটিতে কর্তব্যরত বিরক্তিদগ্ধ মনের অফিসার দ্বিতীয়বার তাকে বলল, 'ইফতাহ ইয়া হিমার!'

এবারে সে আরবীটা পরিষ্কার বুঝতে পারল। আর এটাও বুঝতে পারল যে, টকের ভয়ে স্বদেশ ছাড়লেও বিদেশেও তেঁতুল গাছের অভাব নেই। কোন উত্তর না ক'রে ব্যাগটি খুলে দিল।

অফিসার একটি একটি ক'রে সামান-পত্র বের ক'রে দেখে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ব্যাগে স্ট্যাম্প লাগিয়ে বলল, 'রুহ!'

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, অনেক লোক তাদের আপনজনকে আগিয়ে নিতে এসে অপেক্ষা করছে। তার তো এ মুল্লুকে কেউ নেই। একটু দূরে সরে এসে এক ভারতীয়কে অনুরোধ করল, 'এক মিনট কে লিয়ে মুবাইল দিজিয়েগা, থোড়া ফোন করনা থা।'

ভাল লোক সে। দাড়ি-ওয়ালা লোক দেখে মোবাইল দিয়ে দিল। নম্বর



লাগিয়ে ফোন করলে স্পনসর 'নাআম!' বলে কথা বলতে শুরু করল।

মুনীর বলল, 'আনা ফিল মাত্বার, অস্বালতুল আন।' (আমি এখনি পৌঁছে এয়ারপোর্টে আছি।)

অন্য তরফ থেকে বাত্বহার আরবীতে জবাব এল 'আন্তা সাওয়া সাওয়া তাকসী ইজি। উনওয়ান মাওজূদ।' (তুমি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে চলে এস, ঠিকানা দেওয়া আছে।)

সাধারণতঃ এই শ্রেণীর আরবী শুধু রিয়াযের বাত্বহাতেই নয়, অধিকাংশ আরবী অশিক্ষিত প্রবাসী আরবিয়ানদের সাথে ঐ পঙ্গু ভাষা প্রয়োগ ক'রে থাকে। আরবিয়ানরাও বলে, যাতে আজমীকে বুঝাতে সহজ হয়।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এড়িয়া ছেড়ে মুনীর বাইরে আসতেই গ্লাসের গেটের সামনে এলে অটোমেটিক গেট খুলে গেল। প্রচণ্ড গরম। তখন সন্ধ্যা বেলা। রোডের ধারে আসতেই একাধিক সঊদী ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলতে লাগল, 'স্বাদীক্ব! ওইন রুহ?' (বন্ধু! কোথায় যাবে?)

'স্বাদীক্ব' মানে বন্ধু, সে কথা সে জানে। কিন্তু সে শব্দও যে অবজ্ঞার্থে বিদেশী লোকদের জন্য ব্যবহার হয়, তা সে বহু পরে জেনেছিল।

সে পাশপোর্ট বাড়িয়ে দিলে একজন ছোঁ মেরে নিয়ে দেখতে লাগল। সে ছিল দাম্মাম রোডের। ঠিকানা 'আল-ক্বাসীম' দেখে অন্য একজনের দিকে পাশপোর্টটি বাড়িয়ে দিল। সে বাত্বহার আরবীতেই বলল, 'আরবামিয়া রিয়াল। আন্তা ফী ফুলূস?' (চারশ' রিয়াল লাগবে। তোমার কাছে কি রিয়াল আছে?)

মুনীর বলল, 'মা ইন্দী রিয়াল। আল-কাফীল য়্যুত্বীক।' (আমার কাছে রিয়াল নেই। স্পনসর আপনাকে দিয়ে দেবে।)

কিন্তু ড্রাইভার বিশ্বাস করতে চাইল না। বিশেষ ক'রে রাতের বেলায় কোথায় গিয়ে কাকে খুঁজে বেড়াতে হবে, সেই ভয়ে যেতেই রাযী হল না।

মুনীর চেষ্টা ক'রে অন্য ড্রাইভার খুঁজতে লাগল। কিন্তু অনেকে বলল, রাতে হয়তো কেউ যেতে চাচ্ছে না। সুতরাং রাতটা এয়ারপোর্টে কাটিয়ে দিয়ে সকালে যাবেন, তখন গাড়ির অভাব হবে না।

মুনীর করলও তাই। আবার ভিতরে ফিরে গিয়ে বাথরুমে ওযূ ক'রে ক্বাযা নামাযগুলি সহ এশার নামায পড়ে ঐ মুস্বাল্লাতেই শুয়ে পড়ল। খাবারের প্রয়োজন হল না। যেহেতু প্লেনে যা খাওয়া হয়েছিল, তা রাতটুকুর জন্য যথেষ্ট।

শুয়ে ঘুম আসে না তার। বারবার নূরীর কথা মনে পড়ে। সুতরাং অভ্যাস মতো কাগজ কলম নিয়ে লিখতে লাগল,

কামরূপ এক্সপ্রেসে মন ছুটে চলে ঐ,
দেয়া আছে শিগন্যাল থামিবে না কখনই।
গার্ডসাব আছে কালা কিংবা সে জানে না,
কিংবা সে ছোট ভাবে তাইতো সে মানে না।
হাঁকি কত, 'বাবু বাবু! মন আছে মন মন',
রুখে না তবুও গাড়ি চলে যায় ঝন্‌ঝন্‌।
অক্ষম মন ফিরে আসিবে না কোনদিন,
হানিলেও পদাঘাত নাচিবে সে তাতাধিন।
আপন ভাবিয়া কেহ দেয় যদি খুশদিল,
যাকে দেবে তার থেকে ছিঁড়ে আনা মুশকিল।

ফজরের নামায পড়ে একবার গাড়ির খোঁজ নিল। এক বেদুঈন



যাওয়ার জন্য তৈরী হল। কিন্তু সে আরো প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষায় দেরী করতে লাগল।

এক সময় গাড়িতে রওয়ানা দিল অচিন দেশের অচেনা ঠিকানায়। এয়ারপোর্ট ছেড়ে এসে চারিদিক মরুভূমি পরিদৃষ্ট হল। কোথাও পাহাড়ের চেন। ঘন্টায় একশ' চল্লিশ-পঞ্চাশ কিমি. বেগে গাড়ি ছুটে প্রায় সাড়ে তিনশ' কিলোমিটার চলার পর এল আল-ক্বাসীম। ড্রাইভার স্পনসরকে টেলিফোন করল। সে ঠিকানা বললে বুরাইদাহ শহরের নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে বলল। সেখানে মুনীরকে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে সে প্রস্থান করল।

সালাম-কালাম ও নাম জিজ্ঞাসার পর বুঝা গেল তার কাফীল (স্পনসর) লোক ভাল। বাড়ির মেন গেটের কাছে একটি অতিরিক্ত রুমে তাকে বসিয়ে রুটি খাইয়ে গাড়িতে চড়তে বলল কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। গাড়িতে বসলে গাড়ি ছুটল শহরের বাইরে মরুভূমির দিকে। তাহলে কী ব্যাপার? কাজ কি অন্য শহরে, নাকি অন্য কিছু?

প্রায় ঘন্টা খানেক চলার পর মেন রোড ছেড়ে মরুভূমিতে কাঁচা রোডে গাড়ি চলতে লাগল। প্রায় আধ ঘন্টা চলার পর এক খীমার সামনে এসে গাড়ি থামল।

কাফীল তাকে গাড়ি থেকে নামতে আদেশ ক'রে বলল, 'ইনযিল।'

মুনীর গাড়ি থেকে নেমে অবাক হয়ে সব দেখতে লাগল। খীমার পাশেই এক খোঁয়াড় ভেড়া বাঁধা। খীমার ভিতর থেকে একটি মিশমিশে কালো লোক বের হয়ে এল। সালাম মুসাফাহাহ ক'রে প্রশ্ন করল, 'জাদীদ?' (নতুন?)

মুনীর বলল, 'জাদীদ। আন্তা তা'মাল হিনা?' (নতুন। তুমি এখানে

কাজ কর?)

---নাআম। (হ্যাঁ।)

কাফীল দু'জনকেই সামনে রেখে বলল, 'দেখ মুনীর! এ এখন দেশে যাবে ছুটিতে। এর নিকট থেকে তোমাকে কাজ বুঝে নিতে হবে।'

---কী কাজ?

---ভেড়া চড়ানোর কাজ।

---কিন্তু আমি তো এ কাজ পারব না।

---পারবে না তো এসেছ কী জন্য?

---আমি এসেছি কোন চাকরি করতে, 'গানাম' (ভেড়া) চরাতে নয়।

---তোমার ভিসায় কী লেখা আছে তুমি দেখেছ?

---না। তা তো দেখিনি।

তারপর পাশপোর্ট খুলে দেখিয়ে দিল, তাতে লেখা আছে, 'তারবিয়াতুল মাওয়াশী।'

মুনীরের বুক ধরধর ক'রে উঠল। কাকুতি-মিনতি ক'রে অন্য কাজ দিতে অনুরোধ করেও কোন লাভ হল না। কাফীল পাশপোর্টটি নিয়ে গাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

এবারে মুনীর কাঁদতে লাগল। তামিলনাড়ুর সেই কালো লোকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে তাকে বুঝাতে লাগল।

মুনীর এ দেশের আইন-কানুন কিছু জানত না। ভেবেছিল, সেখানে গিয়ে মনোমতো একটা কাজ খুঁজে নেবে। কিন্তু সে জানত না যে, পাশপোর্টে ভিসাতে যে কাজ লেখা আছে, সেই কাজ করতেই সে বাধ্য। পাশপোর্ট ছাড়া সে পালাতেও পারে না। অন্য কোথাও কাজও করতে পারে না। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে জেল।



সবচেয়ে বড় মুশকিল হল, তামিল লোকটি ছুটিতে গেলে সে একা এই নির্জন মরুভূমিতে থাকবে কীভাবে? যেখানে কোন টেলিফোন নেই, ঘর-বাড়ি নেই, বড় গাছপালা নেই, আর সঙ্গী-সাথী বলতে কেবল কয়েকশ' ভেড়া। এ মহান আল্লাহর মহাপরীক্ষা ছাড়া আর কী হতে পারে?

তামিল লোকটির কাছে ধীরে ধীরে অনেক কিছু জানতে পারল ঃ-

গাধার পিঠে বসে ভেড়া ভালভাবে চরাবে। একটি ভেড়াও কম হয়ে গেলে, তার দাম তোমার বেতন থেকে কাটা হবে।

সকাল আটটা-নয়টায় নিয়ে গিয়ে ঘাস-পাতা এলাকায় চরিয়ে নিয়ে এসে বিকাল চার-পাঁচটায় খোঁয়াড়ে ভরতে হবে।

ট্যাঙ্কিতে পানি আছে, তা ভেড়াগুলিকে পান করতে দিতে হবে। ঐ পানিতে সে নিজেও ওযূ-গোসল করতে পারবে।

গাধাটিরও পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রত্যেক দিন ভেড়ার দুধ দোয়াতে হবে। সেই দুধ কাফীল যথাসময়ে নিয়ে যাবে।

ভেড়ার পায়ের নখ যদি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা কেটে ফেলতে হবে।

যথাসময়ে ভেড়ার লোম কাটতে হবে।

শীত-গ্রীষ্ম, কুয়াশা, বৃষ্টি ও রোদের সময় ভেড়ার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

কাফীল চাল-ডাল ইত্যাদি এনে দেবে। স্টোভে ভাত রান্না ক'রে খেতে পারবে। রুটি খেলে তাও এনে দেবে। তবে খাবার সময় খীমার ভিতরে চারিদিক বন্ধ ক'রে খেতে হবে। নচেৎ মাঝে মাঝে বালি-

মিশ্রিত খাবার খেতে হবে। মরু-ঝটিকায় বালি উড়ে খীমায় ঢুকবে।

রাত্রে খীমা ভালভাবে বন্ধ ক'রে শুতে হবে। নচেৎ সাপ-বিছু ঢুকে ক্ষতি করতে পারে। অবশ্য চোরের ভয় ততটা নেই। তবে জ্বিনের ভয় হলে সেটা আলাদা কথা।

দেশে ফোন করার প্রয়োজন হলে কাফীলের সঙ্গে শহরে গিয়ে ফোন করতে হবে।

কোন কোন সপ্তাহে কাফীল ব্যস্ত না থাকলে তার সাথে গিয়ে জুমআর নামায পড়তে পারবে।

বেতন মাসের মাস পাওয়া যাবে না। তিন-চার মাস পর বেতন পাওয়া যাবে।

দু'বছর পর চার মাসের ছুটি পাওয়া যাবে। তার আগে যেতে চাইলে নিজের টিকিটে যেতে হবে।

মুনীর মনে মনে বলতে লাগল, 'হায়রে দুর্ভাগ্য! ভিসা না দেখেই বোকার মতো চলে এলাম। ভেড়ার মতো এসে ভেড়ার খোঁয়াড়েই পড়লাম। এখন কী করি? এ লজ্জাকর কাজের কথা কাকেই-বা বলি? বাড়িতে তো বলা যাবে না, নূরী ও তার মা-বাপকে তো মোটেই না।'

প্রথম নামাযে যোহরের সময় সে কেঁদে কেঁদে সালাম ফেরার আগে দুআ করতে লাগল, 'রাব্বি আদখিলনী মুদখালা স্বিদ্‌ক্বিঁউ অআখরিজনী মুখরাজা স্বিদ্‌ক্বিঁউ অজআলনী মিল লাদুনকা সুলত্বানান নাস্বীরা।'

বারবার সে বলতে লাগল, 'আল্লাহ গো! এ কোন্‌ পরীক্ষায় ফেললে তুমি আমাকে? আল্লাহ তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর।'

'আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা। অআন্তা তাজআলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলা।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা সহজ করে দিয়েছ তা ছাড়া সহজ কিছু নয়। আর ইচ্ছা করলে তুমিই দুশ্চিন্তাকে সহজ করে থাক।)



'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন।' (অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।)

প্রথম দিন বের হল তামিল লোকটির সাথে ভেড়া চরাতে। মাথার ওপর খাড়া রোদ। শুষ্ক আব-হাওয়া। দেহের চামড়ায় টান ধরছে। ধু-ধু মরুভূমি, ঝোড়ো লু হাওয়া। দূর-দূরান্তে মরীচিকাকে সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে। কোথাও কোথাও ভাঙ্গা গাড়ির অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। মরা উপত্যকায় কোথাও কোথাও আকন্দ গাছ, কোথাও বাবলা গাছ, কোথাও বা অন্য জাতীয় কাঁটা গাছ। রোদে সেই গাছের ছায়া অবলম্বন করতে হয়।

দেশে থাকতে আরবে ছাগল চরানোর কথা সে শুনেছিল। তখন মনে মনে কল্পনা করেছিল, হয়তো সেথায় আম-বন বা শাল-বন আছে, যার ছায়াতে বসে রাখালরা ছাগল চরায়। কিন্তু কোথায় সে কল্পনা? পিপাসায় ঠাণ্ডা পানি পর্যন্ত নেই। সঙ্গে থার্মাসে ক'রে পানি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়।

সপ্তাহ খানেকের ভিতরে তামিল লোকটি ছুটিতে চলে গেল। সে আসবে চার মাস পরে। যত কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল মুনীরের ঘাড়ে। যত পারে সে কাঁদে। বেশী কাঁদে আল্লাহর কাছে নামাযের ভিতরে।

অনেক সময় মনের ভিতরে সান্ত্বনা নেয়। দ্বীনের নবীও ছাগল-ভেড়া চরিয়েছেন। যত নবী এসেছেন, সকল নবীই এ কাজ করেছেন।

অতএব কাজ যত কষ্টেরই হোক না কেন, তার অভিজ্ঞতাও একটি আনন্দের। নবীরা কতই না কষ্ট করেছেন, তাকেও কষ্টে পড়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ধৈর্যের ফল মিঠা হয়। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় নজরুলের গান,

'মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল বেশে।
নীল রেশ্মী রুমাল বেঁধে চারু চাঁচর কেশে।।
তাঁর রাঙা পদতলে পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ-লাবণির ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে।।'

মুনীর ভেড়া চড়ায়, তাতে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করে, এহেন মুসীবতে পড়ে উপদেশ গ্রহণ করে।

একদিন সে আজব জিনিস দেখল। লক্ষ্য করল ভেড়াপালের সর্দার রয়েছে। সে সর্দারি করে এবং বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে পালকে রক্ষা করে। পালের আগে আগে সে যায়। সম্মুখে কোন সাপ বা বড় কাঁকড়া বিছে ইত্যাদি পড়লে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে এক ধরনের শব্দ বের ক'রে পালের গতিপথ রোধ করে।

একদিন দেখল, হঠাৎ সর্দার ভেড়াটি আকাশের দিকে মুখ তুলে নাক টেনে এক আজব আওয়াজ বের করছে। পালের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে সকলকে কীসের প্রস্তুতি নিতে বলছে। সুতরাং ছোট ছোট ছানাগুলি এবং গর্ভবতী ভেড়ীদেরকে পালের মাঝখানে নিয়ে সকলে গায়ে গা লাগিয়ে বসে পড়ল। কেবল মুখগুলিকে বের ক'রে রেখে 'ভ্যা-ভ্যা' শব্দ বের করতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যে মরুঝটিকা বালুকণা উড়িয়ে নিয়ে এসে আকাশ অন্ধকার ক'রে তুলল।

চোখ বন্ধ ক'রে একটি আকন্দ ঝাড়ের গোড়ায় বসে গিয়ে সে মনে



মনে ভাবল, কোন ভেড়ে পুরুষ তো তার স্ত্রী-কন্যার জন্য এই শ্রেণীর প্রতিরক্ষা করতে পারে না।

## (৪)

মুনীর নূরীর কথা প্রায় সর্বদা চিন্তা করে। তাকে পাওয়ার যোগ্যতা তাকে অর্জন করতেই হবে। টাকা উপার্জন ক'রে বড়লোক হতেই হবে। এক রাতে সেই কথা ভাবতে ভাবতে লিখল,

তুমি কি জানো না, এত রাত্রি কেন জাগি?
এত রাত্রি জাগি শুধু তোমারই লাগি---
শুধু তোমায় পাইব বলিয়া,
শুধু তোমার সাথী হতে
ঘুরি আমি পথে পথে
মরু-পথে কন্টক দলিয়া।
সেই বলিয়াছ তুমি
অতি দুর্গম ভূমি
কাঁটা ঘেরি' আছে ফোটা ফুল,
যেখানে হইবে কাছে
সেই পুষ্পোদ্যান পাছে
নদী পারি দিয়া পাব কূল।
তোমার মনঃপূত
মোহ-মায়া আপ্লুত
সেই নয়নাভিরাম ভূমি,
নৈকট্য পাব তোমার

পাব সেই তূর পাহাড়
পাব বন্ধুর পথ চুমি।
আশার প্রদীপ জ্বালিয়া
জানো এত রাত কেন জাগি?
শুধু তোমারই লাগি
তোমারে পাইব বলিয়া।

প্রায় মাস খানেক পর কাফীলের সাথে শহরে গিয়ে জুমআর নামায পড়ল। বেতন তো পায়নি, খাওয়া-খরচ বাবদ কিছু দিয়েছিল। সেই রিয়ালের ভরসায় নিজের গ্রামে টেলিফোন করল। বাড়িতে টেলিফোন নেই। কেবল ভাল খবর পৌঁছে দিতে বলল।

তারপর টেলিফোন করল নূরীদের বাড়িতে। সৌভাগ্যক্রমে নূরীই ফোন ধরল। পরিচয় পেতেই নূরী বলে উঠল, 'সুখের দেশে পৌঁছে আমাদের কথা ভুলে গেলেন?'

---তোমাদের কথা ভুলা যায় না নূরী! আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাদের নুন খেয়ে নিমকহারামী করতে পারি না। আব্বাকে বলো, বেতন পেলেই আমি তাঁর টাকা পাঠিয়ে দেব।

---আপনি টাকার চিন্তা করছেন কেন? কেমন আছেন? আমি ভাল থাকার কথা জিজ্ঞাসা করছি না, ভাল দেশে অবশ্যই ভাল থাকবেন।

---ফোনে সব কথা বলা যাবে না। আমি তোমাকে চিঠি লিখব। আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম জানিয়ে দিয়ো।

লাইন কেটে গেল। মুনীরের শেষের কথাগুলি কেমন কান্নাভেজা মনে হল নূরীর। ব্যথায় বুকটা টনটন ক'রে উঠল। তার কোন ফোন নম্বর আছে কি না, তাও জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল। পস্তাতে লাগল সে,



বেতন কত, তাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

এক মাস পর চিঠি পেল নূরী। মুনীরের প্রথম চিঠি। তাতে তার কষ্টের কথা পড়ে কাঁদতে লাগল। আম্মা সামনে এলে চোখের পানি মুছে নিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে সব কথা খুলে বললে সেও দুঃখ প্রকাশ করল। এজেন্ট আটশ' রিয়াল বেতন বলেছিল। কিন্তু সেখানে তাকে মাত্র পাঁচশ' রিয়াল বেতন দেওয়া হয়। এ সকল খবর শুনে নূরীর আব্বাও মর্মাহত হল।

কিছুদিন পর নূরীর দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই আফতাব আলম তাদেরই বাড়িতে থেকে ভিসা লাগিয়ে রিয়ায গেল। তার বেতন ভাল। সেখানে যাওয়ামাত্র সে মোবাইল ফোন পেয়েছে, গাড়ি পেয়েছে। সে মাঝে-মধ্যে নূরীর আব্বার সাথে কথাও বলে। অবশ্য নূরীর আব্বা-আম্মার মনের মাঝে আফতাব স্থান পেলেও নূরীর মনে কোন স্থান পায়নি। যেহেতু তার মনে তিল রাখার মতোও স্থান অবশিষ্ট নেই। সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে আছে তার প্রাইভেট মাস্টার মুনীরুয যামান।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। মুনীরের তেমন কোন খবর আসে না। মাঝে চিঠি এসেছিল। তাতেও তার খবর ভাল ছিল না। পক্ষান্তরে আফতাব বাৎসরিক ছুটি পেয়ে দেশে ফিরে এল। সঙ্গে নূরীদের বাড়ির সকলের জন্য একটি ক'রে উপহার আনল। নূরীর জন্য ছিল একটি দামী মেক-আপ বক্স। প্রীত হল নূরীর আব্বা-আম্মা।

আফতাবকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রীতে একমত হয়ে স্থির করল, আফতাবই তাদের উপযুক্ত জামাই। ছেলেও ভাল। উচ্চ শিক্ষিত, তবলীগ-ভক্ত। তারা আরও জানতে পারল যে, বিয়ের পর সে ফ্যামেলী নিয়ে যেতে পারবে।

সুতরাং নূরীর অজান্তে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। এই ছুটিতেই তাদের বিয়ে হবে। আগামী ছুটিতে তাকে সঙ্গে নিয়ে নবীর দেশে রওয়ানা দেবে।

বড় সৌভাগ্য নূরীর। কিন্তু নূরী তাতে সন্তুষ্ট নয়। যেহেতু তার মনের জমিতে যে বীজের চারা গজিয়ে গাছ হয়ে ফুল-ফলে সুশোভিত করেছে, তা তুলে ফেলে অন্য এক বীজ রোপণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যার সাথে প্রায় দু'টি বছর উঠা-বসা করেছে, কথা বলেছে, মনের কথা আদান-প্রদান করেছে, হাসি-আমোদ করেছে, তাকে ভুলে নতুন ক'রে অন্য একজনকে কীভাবে মনের সিংহাসনে আসীন করতে পারে?

মা জানত নূরীর মনের খবর। সে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করল, মুনীরের কোন উন্নতি নেই। তার বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। সঊদিয়ায় তার পজিশন ভাল নয়। সে তোকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। এখনও পর্যন্ত একটা মোবাইলও নিতে পারেনি। সে ঋণে জর্জরিত। খালি থলের মতো সে নিজেই দাঁড়াতে পারে না, তাহলে তোকে রাখবে কোথায়?

নূরীর বয়স কম, মন সাদা, প্রেম পবিত্র। মায়ের কথা মেনে নিতে কোনক্রমেই রাযী হল না। কিন্তু বাপের ধমকের কাছে সে মুখে নুন পড়া জোঁকের মত জড়ো হয়ে গেল।

দিন পনেরর ভিতরে তারা দেশে সফর করল। অসহায় তরুণী একটিবার তার পছন্দের মানুষটির সঙ্গে কথাও বলতে পারল না। যেহেতু তার সাথে যোগাযোগ করা তত সহজ ছিল না।

নূরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা আড়ম্বরে আফতাব-নূরীর বিবাহ সম্পন্ন হল। নূরীর মন ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। শুধু পার্থিব স্বার্থ দেখে মা-বাপ তাকে মনের মতো স্বামী থেকে চির-বঞ্চিত করল।



বাসর রাত্রে ফুলশয্যায় সে অঝোর নয়নে অশ্রুপাত করতে লাগল। আফতাব জ্ঞানী বলেই সে তাকে উৎপাত না ক'রে রাত্রি অতিবাহিত করল। সে জানতে পারল না, জানার চেষ্টাও করল না যে, নূরী কেন কাঁদছে। ভাবল, বয়স ছোট বলে কাঁদছে। মা-বাপের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে বলে কাঁদছে, যার জন্য নববিবাহিত কনেরা সাধারণতঃ কেঁদে থাকে।

উপায়-হীন তরুণী আর কত কাঁদবে? তার মাস্টার তাকে বারবার বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার কথা বলত। তাই সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে বাস্তবকেই স্বীকার ক'রে নিল। ভাবল, এটাই ছিল তার নসীবে, এটাই ছিল তার ভাগ্য ও ভাগে।

## (৫)

'এই সংকটময় কর্মজীবন মনে হয় মরু-সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।
তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।।'

মা-মাটি ও স্বদেশের প্রতি টান আবার কার নেই? বিশেষ ক'রে প্রবাসী যখন কষ্টে জীবন-যাপন করে, তখন বেশী বেশী সে সব স্মরণ করে। মনে হয় ফিরে যায় স্বদেশে, ফিরে যায় আপনজনের কাছে। কিন্তু যে স্বদেশে নিজের রুযী-রুটী যোগাড় করতে সক্ষম হয় না, যে আপনজনের কাছে 'টাকা' ছাড়া স্থান পাওয়া যায় না, সে স্বদেশ ও আপনজন ছেড়ে বিদেশে থাকা কি উত্তম নয়?

মন কাঁদে দেশের জন্য, কিন্তু যে কান্নায় 'টাকা'র অশ্রু নেই, সে কান্না

বৃথা।

আপনজনের মায়ায় কলিজা ফেটে যায় পরদেশে, কিন্তু যে মায়ায় 'টাকা'র ছায়া নেই, সে মায়া পিপাসায় রৌদ্রতপ্ত পানি।

মুনীর এ কঠিন কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরতে চাচ্ছিল। অন্য কাজ না পেলে এ কাজে সে ধ্বংস হয়ে যাবে ভেবে নতুন উপায় খোঁজার চেষ্টা করছিল। সুতরাং তামিল লোকটি ফিরে এলে সে কাফীলের কাছে অনুরোধ ক'রে রাখালের কাজ থেকে মুক্তি দিতে বলল। যে কয় মাস সে রাখালি করেছে, সে কয় মাস যে কত কষ্টে কেটেছে, সে একমাত্র মরুবাসী রাখাল ছাড়া আর কে বলতে পারে?

এ দেশে শীতকালে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিময় শীতের দিনে কনকনে হাড়কাঁপানি শীতেও ভেড়া-পালের আহারের ব্যবস্থা করতে বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

কাফীল ব্যস্ত হয়ে পড়লে এবং দু'-এক সপ্তাহ আসতে না পারলে কোন কোনদিন তাকে কেবল কাঁচা টমেটো বা পিঁয়াজ কামড়ে রুটি খেয়ে থাকতে হয়েছে।

থার্মাসে রাখা পানি শেষ হয়ে গেলে উত্তপ্ত মরুর গরমে ভেড়ার দুধ দুইয়ে খেয়ে পিয়াস মিটাতে হয়েছে।

অনেক সময় পথের ধারে বসলে গাড়ি-ওয়ালা পথিকদের অনুগ্রহের পাত্র হয়ে অবশিষ্ট খাদ্য, পানি ও পেপসি গ্রহণ করতে হয়েছে।

ওযূ-গোসলের পানি শেষ হয়ে গেলে অনেক সময় তায়াম্মুম ক'রে নামায পড়তে হয়েছে।

জনশূন্য মরুভূমিতে মানুষ দেখা যায় না। কোন গাড়ি আসতে দেখলে 'হাঁ' ক'রে তাকিয়ে থেকেছে, সে গাড়ির দিকে।



কত রাতে জন-মানবশূন্য মরুভূমিতে একাকী খীমায় থেকে কোন শব্দে শঙ্কিত হয়ে দাঁত কামড়ে দুআ পড়তে পড়তে রাত কাটাতে হয়েছে।

জীব-জন্তুর ভয়ে খীমার চারিপাশে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মনে সাহস সঞ্চার করেছে।

সেখানে সাথের সাথী কেউ ছিল না, কথা বলারও কেউ ছিল না। একাকীত্ব দূর করার জন্য এবং দীর্ঘ নীরবতা ও নির্বাক-অবস্থা কাটানোর জন্য ভেড়ার সাথেই কত কথা বলেছে। একা একা কত কুরআন পড়েছে, কত গজল গেয়েছে।

এ সকল কষ্টের বেড়া আল্লাহর রহমতে সে পার হতে পেরেছে। এখন কাফীল তাকে রাখালির কাজ থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও যে কাজে দিল, সে কাজও বড় কষ্টের। কাফীলের 'মাযরাআহ' (চাষের জমি বা বাগান) আছে। সেখানে তাকে অন্যান্য আরও কর্মচারীর সাথে ছেড়ে এল।

সেখানে সে চাষের কাজ করতে বাধ্য হল।

সেখানে প্রত্যেকদিন গাছে পানি দেওয়ার কাজ করতে হয়।

মাটি খুঁড়ে গাছ ও সবজি লাগাতে হয়।

গরু পালতে হয়, গাইয়ের দুধ দোয়াতে হয়।

গরুর জন্য ঘাস কাটতে হয়।

খেজুর গাছে চড়ে খেজুর পাড়তে হয় এবং সময়ে অতিরিক্ত ডাল-পাতা কেটে ফেলতে হয়।

গাছে চড়তে অস্বীকার করলেও উপায় নেই। কাফীলের কোন ছেলে ভাল, কোন ছেলে মন্দ। কেউ দয়া প্রদর্শন করে, কেউ করে গালমন্দ।

অবশ্য মাযরাআতে এসে তার স্বাস্থ্য ফিরতে লাগল। যেহেতু এখানে সে শাক-সবজি ও মাছ-মাংস ইচ্ছামতো খাবার সুযোগ পেল।

এরপর সে একটি মোবাইলও ক্রয় করল। সর্বপ্রথম সে টেলিফোন করল তাদেরকে, যাদের অনুগ্রহে সে নবীর দেশে আসতে পেরেছে। কিন্তু তাদের বাসায় কেউ টেলিফোন তোলে না। ভাবল, হয়তো বা তারা বাইরে বেড়াতে গেছে। পুনরায় রাত্রের দিকে ফোন লাগাতে চেষ্টা করল, কিন্তু একই অবস্থা, রিং হয়, কেউ তোলে না। ভাবল, হয়তো বা তারা দেশে গেছে।

মাযরাআতে কাফীলের ঘর-বাড়ি আছে, একটি মসজিদও আছে। এখানকার প্রায় মাযরাআতেই এই সিস্টেম। সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটিতে মালিকরা এই বাড়িতে বেড়াতে এসে উন্মুক্ত হাওয়া খায়। শহরের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য এই ব্যবস্থা।

মুনীর যেহেতু ভাল আরবী ও ক্বিরাআত জানে, সুতরাং সে মাযরাআহর মসজিদে ইমামতি করতে লাগল।

যে বাসায় সে থাকত, সে বাসায় অন্য লেবারও থাকত। সেখানে বড় ঠাসাঠাসি ক'রে থাকতে হত। আর সেখানে টিভি-ভিসিআর ইত্যাদিতে নোংরা ছবি ও গান-বাজনা চলত। সবাই কি আর 'আলেম' বলে সম্মান দেয়? সুতরাং কাফীলকে বললে সে তার জন্য একটি স্পেশাল রুমের ব্যবস্থা ক'রে দিল।

উল্লেখ্য যে, এ দেশে সিনেমা-হল নেই। কিন্তু ঘরে ঘরে সিনেমা দেখার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ইউরোপের অসংখ্য চ্যানেল 'সুনামী'র মতো দুর্বার গতিতে প্রবেশ করছে প্রায় প্রত্যেক ঘরে। ডিসের মাধ্যমে মিডিয়া-বিষের এ জ্বালা থেকে কেবল সে বাঁচে, যে নিজেকে বাঁচায়।



ইতিমধ্যে মুনীর কাফীলের অনুমতিক্রমে উমরাহ করতে মক্কা মুকার্রামায় গেল এবং সেই সাথে মদীনা ত্বায়বায় মসজিদে নববী, মসজিদে ক্বুবা ও শেষ নবীর কবর যিয়ারত করল। মনের এত বড় একটা আশা পূরণ হওয়ার ফলে সে যে কত আনন্দিত হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গায় সে ইহ-পরকালের বহু কল্যাণ প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল নূরীকে জীবন-সাথীরূপে পেতে।

রমযান মাস এসে উপস্থিত হল। তারাবীহর নামায পড়াবার দায়িত্ব তারই উপর পড়ল। কাফীল তাকে একটি সওব (সঊদীদের লম্বা জামা) ও শিমাগ (ডোরা কাটা লাল রুমাল) উপহার দিল। তাই পরে সে সমস্ত নামায পড়াতে লাগল।

রমযান বড় ফযীলতের মাস। এই মাসে কাফীলের মনে দয়ার উদ্রেক হল। মুনীরকে বলল, 'তোমাকে অন্য কোন কাজ করতে হবে না। তুমি কেবল এই মসজিদের ইমাম ও খাদেম থাকবে।'

মুনীর যারপরনাই খুশী হল ঠিকই, কিন্তু তার আশা আরও উন্নত ছিল। তার আশা ছিল শহরের কোন সম্মানজনক কাজ এবং সেই সাথে মসজিদের ইমামতিও।

কোন কোন উদার-চিত্ত শায়খ কাফীলের মাযরাআয় 'ক্বাহওয়াহ' (আরবী কফি) পান করতে আসতেন। তাঁদেরকে কফি ঢালতে ঢালতে কথা বলার সময় তাঁরা তার আরবী শুনে প্রীত হলেন। তার পিছনে নামায পড়ে তার ক্বিরাতেও মুগ্ধ হলেন। আর তার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তার উন্নতির আরও একটি পথ খুলে দিলেন।

একজন শায়খ তাকে নতুন ভিসা দেওয়ার ওয়াদা করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাকে তর্জমা-অফিসে কাজ দেবেন এবং একটা

মসজিদ পাইয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং মহান আল্লাহর শত প্রশংসা ক'রে সে রমযানের পরে নতুন ভিসা নিয়ে দেশে ফিরার প্রস্তুতি নিল। ক্রয় করল মা-বাপ ও ভাই-বোনদের জন্য উপহার। নূরীর জন্য নিল একটি কম্পিউটার শাড়ি ও মোবাইল সেট, তার মায়ের জন্যও একটি থাইল্যান্ডী শাড়ি এবং বাপের জন্য একটি জামার ছিট। তার ভাইয়ের জন্য নিল জামা-প্যান্ট।

তারপর তারীখ জানিয়ে নূরীদের বাড়িতে টেলিফোন করল। তখন তার মনে কত আশা। নূরীকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তার মন গাইতে লাগল,

পাবার আগে পাইব বলিয়া
কত পাওয়া ভেসে ওঠে মনে,
ঝাড়ে-ঝোঁপে কত কোপ দিয়া ফিরি
পাইবার আশা-পাওয়া-বনে।
পেয়ে হারাইব না হারাইয়া পাব
না ব্যর্থ হৃদি মম,
না, পাইবার আগে মনোরম চাওয়া
হইবে স্বপ্নসম।

## (৬)

মুনীর এয়ারপোর্টে এসে লক্ষ্য করল, কত পর্দানশীন চেক-পয়েন্ট পার হয়ে আসার পর নিজ নিজ বোরকা খুলে ব্যাগে রাখছে। যে মেয়েরা সঊদী আরবের বাসায় বাস করার সময় লুকালুকি করত, সেই মেয়েরা যেন এখন মুক্ত হয়ে গেল। কালো বোরকার কোরক ভেদ ক'রে যেন



আনন্দের সাথে এক একটি চমৎকার ফুল ফুটে উঠল।

এরাই তারা, যারা দেশ থেকে আসার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই এয়ারপোর্টেই ব্যাগ থেকে বের ক'রে বোরকা পরেছিল। এই পর্দাকে নাকি 'এয়ারপোর্টি পর্দা' বলা হয়!

বোম্বাই ছত্রপতি শিবাজী এয়ারপোর্টে নেমে এমিগ্রেশন চেক ক'রে গ্রিন-চ্যানেলে বের হতে চাইল। একজন কর্মচারী বাধা দিয়ে কাস্টম অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কাস্টমের মাল নেই জানা সত্ত্বেও অফিসার তাকে একশ' রিয়াল দিতে বাধ্য করল।

বের হয়ে আসতেই দু'টি ভিখারী তার কাছে ভিখ চাইল। হাত-ব্যাগে সেই পূর্বেকার থেকে যাওয়া দু'টি পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে দিতে গেল। ভিখারীরা তা নেবে না, বলল, 'আরে সঊদিয়া সে আয়ে হো রিয়াল দে দো।'

মুনীর বলল, 'রিয়াল নেহী হ্যায়, লেনা হ্যায় এহী লো।'

বোম্বাই শহরের ভিলেন ভিখারী গালি দিয়ে অন্য ভিখারীকে বলল, 'আরে ও তো খুদ হী ভিখারী হ্যায়।'

ভদ্রতার খাতিরে মুনীর চুপ থেকে গেল।

যথাসময়ে নূরীর আব্বা ও ভাই এয়ারপোর্টে এসে উপস্থিত ছিল। বড় আনন্দ ও খুশীর সাথে গাড়িতে বসল। নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ নূরীর ভাই তার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আব্বু! দোলাভাই কবে আসবে?'

---তোমার দোলাভাই এই তো গেল। আবার ৯/১০ মাস পরে আসবে।

মুনীর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দোলাভাই কে?'

---আফতাব ভাই। আপাও সঊদী আরব যাবে আগামী বছরে।

নূরীর আব্বা বুঝেছিল, মুনীর নূরীর বিয়ের খবর জানে না। সুতরাং সে আনন্দের সাথে বলল, 'তুমি শুনে খুশী হবে, নূরীর বিয়ে দিয়েছি একটি ভাল ছেলের সাথে। সে রিয়াযে চাকরি করে। সে তোমার পরে গিয়ে আগেই বাড়ি এসেছিল।

মুনীর খবরটি শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। নিরাশ হয়ে মনে মনে বলল, 'আমি তো সব কিছুতেই পিছিয়ে আঙ্কেল! আমার কপালই তো পিছু-পড়া।' তারপর প্রকাশ্যে বলল, 'মা শাআল্লাহ! এ তো বড় খুশীর খবর।'

কিন্তু তার মনের বনে অখুশীর ঝড় উঠে গেল। কেন যে এমন হয় জানি না। যে জিনিস পাবে না বলে মানুষ জানে, অথচ তা অন্য কেউ পেয়ে গেলে মনে কষ্ট পায়, হিংসা হয়। পাওয়ার যোগ্য নয় জেনেও যোগ্যতা লাভের আশায় সে বিদেশ গেল। কিন্তু যোগ্যতা অর্জনের পর সে পাওয়া অন্যের ভাগে গেল। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কী হতে পারে?

গাড়ির ভিতরেই মুনীর মুষড়ে পড়ল। ভাবল গাড়ি থামিয়ে এখানেই নেমে যায়। অথবা নূরীদের বাড়ি না গিয়ে সোজা রেল-স্টেশন চলে যায়। কিন্তু যেতেও বাধ্য ছিল।

বাড়িতে এসে পৌঁছল। নূরীর মা মুনীরকে দেখা করল। কিন্তু নূরী দেখা করতে সামনে এল না। হয়তো বা ক্ষোভ ও লজ্জায় তার নারী-মন এ কথায় সায় দিল না যে, সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, যাকে পেতে মনে-প্রাণে কামনা ক'রে অপেক্ষায় ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে উপহার পৌঁছে গেল হাতে হাতে। আরবের খেজুর



খেল সকলেই। নূরীর মা বড় সন্তর্পণে মেয়ের মতি-গতি লক্ষ্য করছিল। এক্ষণে সে বলল, 'ওস্তাদজীকে সালাম দিয়ে আয়।'

মায়ের বুকে মাথা রেখে নূরী কেঁদে উঠল। মা বেড রুমে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে আবারও বুঝাল। কিন্তু তার মনের আসনে মুনীর যে কতটা জায়গা নিয়ে বসে আছে, মা তার আন্দাজ পাবে কোত্থেকে?

গেল না নূরী দেখা করতে তার মনের মানুষটির সাথে। আজ সে কাছে থেকেও পাওয়ার নয়, হাতের কাছে থেকেও বহু দূরে। সেই তো তাকে দূর ক'রে দিয়ে অন্যকে কাছে ক'রে নিয়েছে, যে কোনদিন কাছে ছিল না।

সন্ধ্যায় মুনীর ইন্ডিয়ার মোবাইল চিপ্স্ নিল। তার নম্বর দিল নূরীর ভাইকে। সে জানত, কেন নূরী তার সামনে আসছে না। আশা করল, কোন সময় নূরী তার সাথে ফোনে কথা বলবে।

পরের দিন সকালে ট্রেন ধরে সে বাড়ি পৌঁছল।

## (৭)

মুনীর বাড়ি এল। খুশীর ঝড় বয়ে আনল। মায়ের খুশী, ভায়ের খুশী, গাঁয়েরও খুশী। সকলে তার নিকট থেকে আরবের খবর, উড়োজাহাজের খবর, চাকরির খবর শুনতে লাগল।

আবার ফিরে যাবে সে নতুন চাকরিতে। পরবর্তীতে সে ফ্যামেলীও নিয়ে যেতে পারবে। মা বলল, 'এবার বিয়ে না দিয়ে তোকে ছাড়ছি না বাবা!'

বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল নানা জায়গা থেকে। কিন্তু মুনীরের মনে বড় দ্বন্দ্ব, বড় ভয়। আঁধারে অজানা জিনিসকে কীভাবে চিনবে সে?

কেমন ক'রে নির্ভুলভাবে বেছে নিতে পারবে তার জীবন-সঙ্গিনীকে। যে ছিল জানা-চেনা, সে তো ভাল নাগর দেখে প্রতারণা করল। এবার সে কোন গর্তে হাত বাড়ায়, কোন সাপের দংশন সে খায়---এই দুশ্চিন্তা। মনে মনে স্থির করল, আলেম মানুষ, আলেম ঘরে বিয়ে করবে। কারণ জ্ঞানীরাই জ্ঞানীর এবং গুণীরাই গুণীর কদর করবে।

'ফুল-সুরভির কদর জানে বুলবুলি আর রাজ-পরী,
মণি-মুক্তার কদর করে নৃপতি আর জওহরী।'

অপেক্ষায় থাকল কোন আলেমের ঘর থেকে তার বিবাহের প্রস্তাব আসবে। এলও একদিন এক তালেবে ইল্‌ম সেই প্রস্তাব নিয়ে। বড় আলেমের মেয়ে। মনে মনে ভুল ধারণা করল, বড় আলেমের মেয়েও নিশ্চয় বড় আলেম হবে।

প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে পাত্রী দর্শন করতে যাওয়ার দিন এল। সঙ্গে সে সঊদী আরব থেকেই উপহারের আংটি নিয়ে এসেছিল। কনে দর্শনের সময় কনের বাপের হাতে সেই আংটি দিয়ে পরিয়ে দিতে বলল। কনে সুন্দরী। পছন্দ হল তার। কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসা শব্দ তরঙ্গে বুঝা গেল, কনের আংটি পছন্দ হয়নি। নিমেষে সে বুঝে নিল, কনের মন আর তার মন এক নয়। আশঙ্কা হল, যে জিনিস সে নিজে পছন্দ ক'রে কিনেছে, সে জিনিস অপছন্দ হলে প্রত্যেক বিষয়েই হয়তো এমন ভিন্নতা থেকে যাবে।

কিন্তু তেমন হওয়া জরুরী নয়। তবুও তার মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল।

সাত-পাঁচ ভেবে মুনীর 'তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহ' বলে কথা দিয়ে চলে গেল। বাড়ি পৌঁছে দেখে-আসা বউকে কল্পনা ক'রে একটি কবিতা রচনা করল,



রুম্মানা দূর সে না
কাছে অতি নিকটে
হৃদি তটে স্মৃতিপটে
ভাসে সে অকপটে।
দূর ভয় অতিশয়
উড়িবে কি আসিবে,
আকাশে কি বাগিচায়
ফুল হয়ে হাসিবে।
জল নাই খোলতাই
নাই ফুল-মনে তার,
মেঘ যদি বর্ষে না
নাই কি গো প্রেমাসার?
রুম্মানা মুছবে না
দর্শন-স্মৃতিটি,
রাখিলাম মনে গেঁথে
সালামের প্রীতিটি।

বিয়ে ঠিক হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ল। সাথী-বন্ধুদের কেউ-বা হিতাকাঙ্ক্ষী বেশে, কেউ-বা হিংসাবশে কনের বদনাম করতে লাগল। কনের আগের বোনদের ব্যবহারের শোনা অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকে অনেক রকম বলল, 'ওদের অহংকার আছে, আভিজাত্য গর্ব আছে, স্বামী মানে না, কনে দেখতে খুব ভাল নয়, অর্থ-সম্পদ কিছু পাবে না ইত্যাদি। শুনে কান-মন ভারী ক'রে মুনীর লিখল,

শুনিলাম নাকি তুমি

জান নাহি ভালবাসা,
এমন বরষা তুমি
ভরসা নাহিক কোন
আগন্তুক বসন্ত লাগি
কিছু কিশলয় আনিবার
অন্তঃসলিলা তুমি
অহম্ সলিলে
রূপের অনিলে আবার
দাহিকা তোমার---
ভয়ানক অতি গতিদ্বয়
দুর্দম, উচ্ছৃঙ্খল তুমি
শত বাধা করি উল্লংঘন
করিবে কি ক্ষতি-ক্ষয়?
কাঁচ না কাঞ্চন তুমি
চোখে দিয়ে ধাঁধা
মাধুরিমা-হারা
নিরস আলাপে তোমার
না জানি কত সুখ,
না কত আছে জ্বালা।

দ্বন্দে পড়ে সে ছন্দ হারিয়ে ভাবতে ভাবতে আরো লিখল,

তাহাকে করিলে বরণ শুধুই তাহারে পাইবে,
আর কিছু না, না সম্পদ, না ধন আমরণ।
কিন্তু 'সেই' যদি 'সারথী' হয় তবে 'সেই শ্রেষ্ঠধন'



না-না, দাম্ভিকা সে বংশানুক্রম আক্রমণ করিলে
তাহার যমের নখরে প্রখর হইয়া উঠিবে জীবন।
কিন্তু ব্যতিক্রম কি নাই? পাঁচের এক যদি হয়
আদর্শ। হুঁ, অধরে শশধর সে কিন্তু নহে পূর্ণেন্দু।
প্রথম রজনীর তিমির-মেশা আবছা তার জ্যোৎস্নালোক---

বিয়ে তাড়াতাড়ি হতে হবে। কারণ, তাকে সঊদিয়া ফিরতে হবে। হয়েও গেল খুব শীঘ্রই বিয়েটা।

বাসর রাতে ফুলশয্যায় স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দুআ পড়ল। স্বামী-স্ত্রীতে দু'রাকআত নামায পড়ল। তারপর বিছানায় কোলে টেনে নিয়ে একটা চুম্বন দিয়ে বলল, 'খুশী হয়েছ তো বেদানা?'

একটু অনীহার হাসি হেসে বলল, 'নিজের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়ি এলে কেউ খুশী হয় বুঝি? আর আমার নাম 'বেদানা' তা তোমাকে কে বলল?

মুনীর মনে মনে বলল, 'বাব্বাঃ! এ যেন খড়িশ সাপের ছানা!' মুচকি হেসে বলল, 'ওহো, তুমি জান না, তোমার নামের মানেই বেদানা। তোমার নাম 'রুম্মানা' নয় কি?'

---হুঁ। তাহলে রুম্মানাই বলবে।

---কোন্ ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছ তুমি?

---ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত।

তারপর দু'জনেই নীরব। ক্ষণেক পর মুনীর বলল, 'তুমি আমাকে "আপনি" না বলে "তুমি" বলছ কেন?'

---আমার বড় দোলাভাই বলে, 'স্বামীকে "আপনি" বললে দূর দূর লাগে। আর "তুমি" বললে কাছের লাগে। তাইতো আল্লাহকে "তুমি"

বলা হয়।’

---তাহলে ‘তুই’ বললে আরো কাছে লাগবে। আল্লাহ অতি কাছে বলেই তো তাকেও ‘তুই’ বলা হয়। তাই নয় কি?

---না, ‘তুই’ তো ছোটদেরকে বলে। আর ‘তুমি’ বলে সমমানের বন্ধুকে।

---তাহলে আমি তোমার সমমানের বন্ধু, তাই বল? কিন্তু কেবল সাধারণ বন্ধু হওয়ার সাথে সাথে স্বামী কি শ্রদ্ধারও পাত্র নয়?

---তা হবে। কিন্তু আমি তোমাকে ‘তুমি’ই বলব। আমাকে এটাই ভাল লাগে।

---বেশ। তাই বলো।

তারপর আবার নীরবতা ও বিরতি। কিছুক্ষণ পর মুনীর বলল, ‘তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না?’

---জিজ্ঞাসা আবার কী করব?

---এই আমার কয়টা বউ, কয়টা ছেলে-মেয়ে?

---জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা ফালতু। আর বাকী খবর তো ধীরে ধীরে জানতেই পারব।

---খেলা করবে না?

---রুমের ভিতর আবার খেলা হয়? এত ছোট নি-মুরি ঘর তোমাদের। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

---হাডুডু খেলতে চাও বুঝি? লুডু খেলা খেলবে?

---আমি ও খেলা জানি না। মৌলবীরা আবার ঐ খেলা খেলে?

---যে খেলা জান, সেই খেলাই খেল।

---আমি কোন খেলাই জানি না। আমার ঘুম আসছে।



তারপর একটা লম্বা হাই তুলে দেওয়াল দিকে মুখ ক’রে শুয়ে পড়ল নববধূ রুক্সানা। রাত অনেক হয়েছে। ঘুম অবশ্যই আসবে। তার কাছে স্বামীর পরিচয় ও প্রেম অপেক্ষা ঘুমের প্রেম অনেক পবিত্র, অনেক শ্রেষ্ঠ।

প্রথম রাতেই মুনীর বুঝল, নির্বাচন ভুল হয়েছে। স্ত্রীর কথায় ও আচরণে সত্যিই অহংকার রয়েছে, আভিজাত্য গর্ব রয়েছে। শর বা আখ-পাতার মতো তার সকল কথাবার্তা। মন খারাপ ক’রে আর কিছু না বলে সেও মাথা গুঁজে শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নববধূ নাক ডাকতে লাগলে সে উঠে খাতা-কলম নিয়ে যেন ফুলবাগানে বড় একটি ফোটা গোলাপের দিকে বিমুগ্ধ-নয়নে তাকিয়ে কবিতা লিখতে লাগল,

গুলশন গুলশন, ওগো প্রমদা সতী!
কথা কও কথা কও প্রিয়ে,
আমি আসিয়াছি ফিরে পুনরপি
তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাণপ্রিয় পতি।
চাহ বঙ্কিম নয়নে আকুঞ্চনহীন
ভ্রূ-আবর্তনে চাহ চাহ হে প্রেয়সী
বহু দিনের জমা কথা
রহিয়া বুকের ব্যথা
বাড়াইয়াছে, যাহা আজ কহিব প্রকাশি।
কহ গুলশন শপথ লহ
যৌবন-সিন্ধু, রাতি ভয়াবহ
এ জীবন-তরী তুমি তো মাল্লা-মাঝি,

পাপে-পুণ্যে সতীত্বের বাঁধনে
ত্যজিয়া স্বার্থ অসাধ্য সাধনে
রবে না কি তুমি হয়ে মোর সাজি?
বল গুলশন এ শন্‌শন্‌ বেগ
ফোটা গুলবাগে যদি ঝোড়ো মেঘ
চাহে হানা দিতে তবে হে তখন
তুমি গুলবাহার, গুলচমন, গুলশন।

তাপর আলো নিভিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গেল।

ফজরের নামায পড়ে ফেরার পথে মোবাইলে অপরিচিত কল রিসিভ করল মুনীর। খুবই পরিচিত গলা। নূরী সলজ্জ কণ্ঠে খুবই সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে কথা বলছে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি?'

স্বাভাবিকভাবে মুনীর বলল, 'অআলাইকুমুস সালাম। ভালই আছি। তুমি কেমন আছ?'

---ভাল। আব্বা আমার জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দিল। আপনার ফোন না থাকায় আমি আপনাকে জানাতেও পারলাম না।

---আমিও তোমাকে জানালাম না, বিয়ে ক'রে নিলাম।

---কবে?

---গত কালই।

---বউ কেমন হয়েছে? কী নাম?

---ভাল, নাম রুম্মানা।

---নামটাও বড় ভাল। সুখী হন আপনি। আমাকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।



---তুমিও সুখী হও নূরী। ভাগ্যের লেখা কেউ কি খণ্ডন করতে পারে?

এবারে নূরী কাঁদতে লাগল। লাইন কাটতে যাওয়ার আগে বলল, 'মাঝে মাঝে ফোন করবেন।'

---সেটা কি ঠিক হবে?

---ছোট বোন মনে ক'রেই করবেন।

---বোন মনে করতে করতেই তো বান আসে!

---আপনি কি বউ নিয়ে যাবেন সঊদিয়ায়?

---ইন শাআল্লাহ আগামী বছরে।

---আব্বা বলেছিল, 'ও কোনদিন ফ্যামেলী নিয়ে যেতে পারবে না।'

---সত্যিই বলেছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

---সবই ভাগ্য।

---ওটাই সর্বশেষ কথা।

---রাখছি, আসসালামু আলাইকুম।

---অআলাইকুমস সালাম।

কি মধুর কথা নূরীর। আর নীরস বেদানার কথা বড় বেয়াদবানা। নারীতে নারীতে কত প্রভেদ!

সকাল বেলায় নববধূ নিজের আত্মীয় তরুণী (ডোলার বিবি)র কাছে গিয়ে বসল। সামনে পড়লেও ফিরে চেয়ে দেখে না মুনীরের দিকে। কেমন যেন অনীহা, অবজ্ঞা অথবা অনবধানতা।

শ্বশুর-বাড়িতে গিয়েও একই অবস্থা। সবারই সাথে হেসে কথা বলে, কেবল স্বামীর কাছেই গম্ভীর হয়ে যায়। স্বামীর কাছ ঘেসতেও চায় না। রাতে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে যায় মুনীর। রুম্মানা সবার কাছে বসে

থেকে সবশেষে উঠে গিয়ে দেওয়াল দিকে মুখ ক'রে শুয়ে পড়ে। স্বামীকে জাগায় না। তার প্রতি কোন কর্তব্য আছে কি না, তাও ভেবে দেখে না।

মুনীরের বাড়িতে এসে মা-বোনদের সাথেও বনে না। 'আলেমের বেটি' আর নতুন বলে তারা তার কদর করে। শ্বশুর-বাড়িতে এসে সে এ বাড়ির পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে চায় না। নিজের পরিবেশ মতোই চলতে চায়। এ গ্রামের কোন মেয়ে বিয়ের পর শেলোয়ার-কামীস পরে না, ও বেপরোয়া হয়ে সেটাই পরবে।

বাড়িতে মা-বোন সাবান ব্যবহার করে। গরীবের সংসার তো। কিন্তু বেগম রুম্মানাদের জমি-সম্পদ বেশী নেই, তবে বড়লোকি চাল আছে। পেটে ভাত না থাকলেও মুখে পান নেওয়া তাদের অভ্যাস আছে। সুতরাং নববধূ হয়ে শ্বশুর-বাড়ি এসেও সে অভ্যাস অনুযায়ী দাবী করল, তার জন্য শ্যাম্পু এনে দিতে হবে।

মা মাথার চুলে নারকেল তেল দেয়, বেগম সাহেবা বলেন, তাদের বাড়িতে নাকি কোন মেয়ে অথবা ছেলে নারকেল তেল ব্যবহার করে না। সবাই ফুলেল তেল ব্যবহার করে। আর তাকে চাই কেয়ো-কার্পিন তেল। বোরোলীনে তার ত্বকের যত্ন হবে না, তাকে কিনে দিতে হবে ফেয়ার এ্যাণ্ড লাভলী। কমা দামের কোন জিনিসই তার পছন্দ নয়। তোলা শাড়ি হাতে ধোবে না, লণ্ড্রিতে দিয়ে ধোয়াতে হবে। ভাগ্যে সঊদিয়া এসেছিল মুনীর। নইলে যে কী হত?

মুনীর যথাসাধ্য শরীয়ত মেনে চলবে বলেই আলেম ঘরে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সে ঘরের পরিবেশে প্রতিপালিত রুম্মানা তার অনেক কাজকে অতিরঞ্জন মনে করে।



দোলাভাইদের সাথে মুসাফাহা ও হাসি-মজাক করতে নিষেধ করলে বলে, 'বেশি বাড়াবাড়ি!'

চাচাতো-খালাতো ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করলে বলে, 'আমাকে তুমি সন্দেহ করছ।'

পর্দায় চেহারা ঢাকতে বললে বলে, 'যত পিতপিতিনি!'

রেডিওতে খবর শুনতে শুনতে মিউজিক বেজে উঠার সময় সাউন্ড কমিয়ে দিতে বললে বলে, 'অত মানা যায় নাকি?'

বাড়ির জানালার ধারে দাঁড়াতে মানা করলে বলে, 'এত কড়া হওয়া ভাল নয়।'

মুনীর আলেম মানুষ। তাকে বুঝায়। কিন্তু অবুঝ মেয়ে বুঝ মানে না। সে স্ত্রীর মনের পিছনে ছুটে, কিন্তু তার মন আরও সামনে ছুটে পালায়। বঞ্চিত হৃদয়ে মুনীর কবিতা লেখে ঃ-

তুই কি বারীরা করিবি তোরে
মুগীস করিয়া মোরে
ফিরাইবি কি অলি-গলি ধরে
আমি ছুটিব নেশার ঘোরে।
চরমে উঠিয়া শরমে মরমে মরিব আমি যবে,
সেদিন সুপারিশ তোর কাছে কি রে বিফল গণ্য হবে?
ভাবি নাই তবু আমি
তবে অবিরাম দিবাযামি
ভাবিতেছি শুধু তোর 'মন জয় অভিযান' হবে কবে?
তাই হু-হু করি জ্বলে ওঠা বুক দমিতেছে নীরবে।
'কচি খুঁকী' তুই তাই কি রে তোর সেই সুলভ মন,

কিংবা আভিজাত্য-গর্ব দিতে আছে প্রলোভন?
কেন এ অনীহা অবহেলা তোর কিসের দ্বিধা এত?
যার ব্যবহারে স্বামী খোশ নয় সতী নহে রে সে তো।
শোন কামিনী ওরে---
কাঁচ নয় তুই কাঞ্চন হ' বলি বারেবারে তোরে।

রুম্মানা বিবি পড়ে কিছু না বুঝেই বলল, 'আমার দোলাভাই এর চেয়ে আরও ভাল কবিতা লিখতে পারে।'

মুনীর আবার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে তার মনের নাগাল পেতে, প্রেমের পরশ পেতে, কিন্তু বিফল মনোরথ। আবারও কবিতা লিখে পড়ে শোনায় তাকে,

শয়নে-স্বপনে আর নিশি জাগরণে
ফুল হয়ে ফোট কেন মোর হৃদিবনে।
মন-সিংহাসনে যদি না বসাবে মোরে,
বাঁধিলে কেন হে আমায় প্রণয়ের ডোরে?
রুখিলাম যত গতি ছিল স্রোতোমান,
তাহারই দিতেছ তুমি এই প্রতিদান?
রুম্মানা শিশুমনা ছাড়ি এবে তোড়ো ঘুম,
জীবনের উৎস কি ভাবিয়াছ নিঃঝুম?

তবুও রুম্মানার ঘুম ভাঙ্গে না, চেতনা ফেরে না। সে নিজের সুমধুর স্বপ্নঘোরে বেশ মজে থাকে। মুনীর আবারও বুঝায়, কিন্তু সে 'অবুঝে বুঝাবে কত বুঝ নাহি মানে, আর ঢেকিরে বুঝাবে কত নিত্য ধান ভানে।'

তার মনে সন্দেহ হয়, হয়তো বা তার সাথে অন্য কারো প্রেম-



ভালবাসা আছে। তাই সে তাকে অনীহা করে। তাকে জিজ্ঞাসাও করে, কিন্তু বলে, 'আমি ওসব প্রেম-ট্রেম বুঝি না।' আর ছোট শিশুটির মতো আচরণ প্রদর্শন করে। মুনীর বড় ধৈর্যের সাথে তাকে বুঝায় আর বুঝায়,

হেন মতি কেন হে তোমার
যেন গতি ভয়ঙ্কর অতি দুর্বার
এ কি সেই চাওয়ার এই পাওয়া?
কার ত্রুটি, যাচিঞার, না দানিবার?
ভাবিবার পথ নাহি তবু
শুধু ভাবি হৃদয়ের মাঝে বারবার।
আসলে ভাবিয়া নকল, চিনি ক'রে বালি
ভিক্ষা দাও কার হাতে? মোর ডালি খালি
বুঝ নাহি খুঁজ কারে
বাঁধ কারে প্রেম-ডোরে
কুদরত বেঁধেছে যারে ছিঁড়িবে কি তুমি?
নিদাঘ তুমি, বর্ষার নাহি আশা নাহি মৌসুমি।
তুমি কি ভিখারিনী, তুমি কী চাও বলো?
'নূর' না 'নার' তুমি ? দাউ দাউ জ্বলো।
কে তুমি কার তুমি, কি বা চাহ মনে,
কেই বা আসীন তোমার হৃদি-সিংহাসনে?
শিশুমনা ছাড়ি বুঝো মোর মনোগতি,
সতত ঘুরণ-চাকি নাহি যার বিরতি।
বারে বারে বলি মন, মন চাই মন,
মন না দানিলে মন পাবে না তখন।

পরিশেষে ধমক শুরু হয়। আর তাতে সে শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে। অনেক সময় চোখে বালি দিয়ে কাঁদে। স্বামীকে আসামী বানিয়ে বাপের বাড়িতে অভিযোগ করে, 'আমাকে ডাঁটে, ধমক দেয়, মেজাজ দেখিয়ে কথা বলে, আমাকে মোটেই দেখতে পারে না। আমি ওর চোখের বালি। ও আমাকে নয়, আমার দেহকে ভালবাসে।'

মুনীর তাও নিজ নোট বুকে নোট করে, স্ত্রীকে পড়ে শোনায়,

মোর নাহি কদর অনাদর হেতু
পারি না তোমারে দেখিতে
যা দেখি তা শুধু ক্ষুধা নিবারণে
জ্বলে ওঠা বুক শীতল করিবারে।
এ সত্য কি পড়ে না ধরা তোমার চোখে-বুকে?
কাঁদাই আমি? না-না তুমিই নিজ দোষে
ঘোলা ক'রে পানি বল, দিলে না পিপাসায়
বুঝে দেখ কিংবা মনে রেখো গেঁথে
একদিন এ ভুল পড়িবে গো ধরা
যদি না থাকে অহমিকা তোমার
বলিবে কেন করেছিনু হেন
আর যদি হারাইনু আশা সম্প্রীতি
তোমার ঐ অবজ্ঞার নোনা সিন্ধুতে
তাহলে ধিক্ শত ধিক্ মোর ব্যর্থ জীবনে
আর 'ছিঃ ছিঃ' তোমার সতীত্বে ও নারীত্বে।
ডালে খালে জীবন আর কাপুরুষতায়
ছিঃ! ও ভীরু জীবনের দাম কী আছে?



আড়ি আড়ি ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

শ্বশুর-বাড়ির লোকে রুম্মানাকে বুঝায়। মুনীরকেও সান্ত্বনা দেয়। 'একটু মেনে ও মানিয়ে চলো বাবা! এখন কাঁচা বয়স তো। বয়স চাপলে ঠিক হয়ে যাবে।'

মুনীর স্ত্রীর ভালবাসা পায় না, যথাসময়ে দেহ-মনের মিলন পায় না। রোমান্টিক মনে রোমান্সের কোন ভাব-ভঙ্গি বা কথা পায় না। তাই তার বুকখানি শূন্যতায় সউদী আরবের মরু-সাহারার মতোই খাঁ-খাঁ করে। 'বাক্য কি বলিবে তারে মন যারে নাহি পায়।' সুতরাং সে প্রয়োজন ছাড়া স্ত্রীর সাথে কথা বলে না। পরন্তু কারো নিকট অভিযোগ করতেও পারে না, কাউকে কিছু বলতেও পারে না। আর বলতে পারে না বলেই লিখে যায়।

সব পেয়েও কী যেন পাইনি
হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণ যেন শূন্যতা
অনুভব করছে। মন তাই প্রাণকে
বারবার প্রশ্ন করছে, তা কী?
কিন্তু কোন সদুত্তর নাই প্রাণের।
মলিন হাসিটিকে অধরে মিলিয়ে কী যেন বলতে ও চায়
তবে বলতে পারে না সে।
হ্যাঁ, তার আঁখি দু'টির মিটিমিটি চাহনি
যেন তার বলতে চাওয়া কথাকে
বুঝিয়ে দিতে চায়।
কিন্তু মন তা বুঝতেই চায় না।
পারছে না বৈকি? আর না বুঝে হুঁ-হুঁ করা ওতো ঠিক না।

বল কে পার বলতে মন-রাজার কথা
যে পারবে তার পুরস্কার?
দিল-রাজনন্দিনীর সাথে তার পরিণয়
আর বাকি দেহ-সিংহাসন তো তারই।
বল তো দেখি। ঠিক হতে হবে কিন্তু।

এক রাত্রে কথায় কথায় মুনীর নিজের দাম বাড়াতে চাইল। বলল, 'তুমি আমার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ কর না, আমার যত্ন নাও না। আমার কথা মান না। বোম্বাইয়ে একটি মেয়ে ছিল, সে খুব স্মার্ট, খুব মিষ্টি মিষ্টি তার কথা। তারা খুব বড়লোক। আমার সাথে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। আমি আলেমের মেয়ে করব বলে তোমাকে চয়েস করেছি।'

তখন চট্ ক'রে রুম্মানা বেগম বলতে লাগল, 'আমারও তো একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। অনেক রোযগার তার। তারপর এক মাস্টারের সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে দেখতেও বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু আব্বা বলল, আলেম দেখে দেব। তোমার লম্বা দাড়ি বলে তোমার ব্যাপারেও আমার মেজভাই রাযী ছিল না। আমাকে বারবার বিয়েতে অসম্মতি জানাতে তাকীদ করেছিল.......।'

মুনীর বেওকুফ বনে তাকে চুপ হতে বলল। তারপর সে লিখল,

এক দুই নয় তিনে আমি
ঘিনে আমি, আমি বিনে দিবা-যামী
স্বামীরূপ হে মধুপ
কেবা উঠিয়াছিল জাগি
তোমার ঐ স্বচ্ছ মনের মুকুরে?
রূপ নাহি ধুপ নাহি শুনি



নিশ্চুপ রহিলাম তবু,
তোমার প্রেমের পবিত্র নলিনী হেতু
যাহা ফুটিয়াছিল মোর হৃদয়-পুকুরে।
'ইজ্জত কী নফরত' তাহাদের কাছে
যারা তোষামোদ করে, সুযোগ সন্ধানী,
কিছু পাইব বলিয়া, দাও যদি তুমি
মোর হৃদয় ভরিয়া, সাজাইয়া
তোমার ঐ পূত প্রেম ফুল-কাঞ্চন দানি।
তোমার সরল মনের তরল ধাতুটি শুধু
গড়াইয়া দাও আমার সুমন ছাঁচে,
আশা বল ভরসা সবি
হউক সত্যের রবি
বুঝি যেন পেয়েছি কাঞ্চন আমি
হাত লাগেনি কাটেনি রঙিন কাঁচে।

অবুঝ বেদানা বেগম বুঝ মানে না। বেদনা দিয়ে, বেদনা নিয়ে সংসার করতে থাকে। এমন এক মহিলা সে, যে---

স্বাধীনতায় পড়লে বাধা
পেতে বসে আড়ি,
মুখ নামিয়ে কয় না কথা
মনকে করে ভারি।

আগে কথা না বললে দিনের পর দিন তার সাথে কথা বন্ধ রাখে। বুঝতে ও বুঝাতে, মানতে ও মানাতে তার সময় শেষ হয়ে যায়। অবশ্য এই ফাঁকে রুম্মানার পাশপোর্টের কাগজ-পত্র কলকাতায় জমা ক'রে

আসে। বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসে। বিদায়ের দিনের পূর্ব রাত্রে বিছানায় শেষ আদর করার ছলে মুনীর রুম্মানাকে বলল, 'বল তো, আজ আমি তোমার বিছানায়, কিন্তু কাল এতক্ষণ কোথায় থাকব?'

চট্‌ ক'রে নীরস সুন্দরী জবাব দিল, 'তা আমি কী ক'রে জানব?!'

সকালে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সে নূরীদের বাড়ি গিয়ে সেখান হতে পাড়ি দিল কর্মস্থলে সঊদী আরবে।

## (৮)

কথামতো সেই শায়খ মুনীরকে যথোপযুক্ত চাকরি দিলেন। কিন্তু মসজিদে চাকরি পেতে সমস্যা দেখা দিল। এ দেশের আইনে যোগ্য হলেও কোন প্রবাসীকে কোন সরকারী মসজিদের খিদমতে নিযুক্ত করা যাবে না। অবশ্য এলান দেওয়ার পরেও কোন সঊদী কোন মসজিদে চাকরির জন্য দরখাস্ত পেশ না করলে, তখন প্রবাসীকে দেওয়া যাবে। পরবর্তীতে কোন সঊদী উক্ত মসজিদের জন্য আবেদন করলে বিদেশীকে হটিয়ে স্বদেশীকে বহাল করা হবে।

শায়খের চেষ্টার মাধ্যমে মুনীর মসজিদের ইমামতি পেল। দেশের মতো এখানকার মসজিদে গুঁতুনি খেতে হয় না। জামাআতের পালি খেতে হয় না। মসজিদ সাফ করতেও হয় না। কোন ছেলে-মেয়ে পড়াতে হয় না। কাজ কেবল যথাসময়ে নামায পড়ানো।

জামাআতের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ল। এক বছরের মধ্যে সেও 'শায়খ মুনীর' বলে পরিচিত হয়ে গেল।

অতঃপর ফ্যামেলী ভিসা বের ক'রে দেশে গিয়ে রুম্মানাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে আসার প্রস্তুতি নিল।



কিন্তু রুম্মানা যেন যেতে চায় না। সে চায় প্রত্যেক বছর স্বামী ছুটিতে দেশে আসুক। সেখানে একাকিনী থাকতে হবে জেনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করে। বাপের বাড়ির লোক বুঝায়, 'স্বামী-সুখে বনবাস ভাল। হজ্জ-উমরাহ করতে পাবি। জাহাজ চাপতে পাবি।' ইত্যাদি।

পরিশেষে নিমরাযী হয়েই একদিন অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর সাথী হয়ে বিদায় নিল।

মুনীর এবারে আর নূরীদের বাড়ি গেল না। ইচ্ছা ছিল নূরী ও রুম্মানার মাঝে পরিচয় করানো। কিন্তু নূরী আগেই চলে গেছে রিয়াযে।

বুরাইদায় এসে রুম্মানার শিশুসুলভ মনের ঝোঁক শুরু হল। এইভাবে চব্বিশ ঘন্টা সে চারটি রুমের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারবে না। যদিও তা আরামের সকল সামান দিয়ে সাজানো আছে। বাসায় এসি আছে, ফ্রিজ আছে, ঝাড়ু দেওয়ার মেশিন আছে, গ্যাসের চুলো আছে, ওভেন আছে, মাইক্রো-ওভেন আছে---তাতে এক মিনিটের কম সময়ে তরকারি ইত্যাদি গরম করা যায়। গ্যাজেট আছে---তাতে গরম পানিতে গোসল করা যায়। চুল শুখানোর মেশিন আছে। ওয়াশিং মেশিন আছে---তাতে আরামসে কাপড় ধুয়ে শুকানোও যায়। পালঙ্ক ও দামী গদি আছে, সোফা আছে, তোফা আছে, আলমারি আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে। কম্পিউটার আছে, টেলিফোন আছে। টিভি আছে, ভিসিআর আছে---তাতে দ্বীনী ও বৈধ প্রোগ্রাম দেখা যায়।

হেথা-সেথা যাওয়ার জন্য একটা অল্প দামের গাড়িও আছে।

কিন্তু মনের ময়না এসব নিয়ে কী করবে? 'মন আছে হায় কেয়া-বনে, কী করবে তার সিংহাসনে?'

মুনীর ডিউটিতে থাকলে, তার দেশের শোক আরও বেড়ে যায়। কেঁদে

কেঁদে চোখ লাল ক'রে রাখে। পুরনো ম্যাক্সি পরে। দেহে কোন অলঙ্কার রাখে না। এ যেন এক বিধবা মেয়ে। দেশ-স্বামীর শোকে নিজেকে এইভাবে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে।

মুনীর স্ত্রীকে ক্ষান্ত ও শান্ত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তার চেষ্টা বৃথা হয়। তার সুখের মধুও বিষে পরিণত হয়। দোকানে দোকানে, মসজিদের জামাআতে জিজ্ঞাসা করে, এখানে কোন বাঙালী ফ্যামেলী আছে কি না?

প্রায় এক মাস পরে এক ইঞ্জিনিয়ার ফ্যামেলীর সন্ধান পাওয়া যায়। তার স্ত্রী ভদ্র মহিলা বড় স্নেহময়ী। তারও ১২/১৩ বছরের মেয়ে আছে। তাদের বাড়ি বাংলাদেশ। সব কথা খুলে বললে তিনি মুনীরের বাড়ি আসতে রাযী হন। ভদ্র মহিলা নিজের মেয়ে মনে ক'রে রুস্মানাকে খুব সান্ত্বনা দেন। সেদিন সে বড় খুশী হয়। খুশী হয় তাঁর মেয়ে লীরাকে পেয়ে।

পরবর্তীতে তাঁরা মুনীরকে সস্ত্রীক দাওয়াত দিলে এবং রুস্মানা সেখানে গেলে আনন্দ পায়। তবুও শিক্ষাগত যোগ্যতায় যেহেতু খাপ খায় না, তাই মন ততটা ফ্রি হয় না।

নূরীর সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয় করিয়ে ফোনে কথা বলিয়েও মন ফ্রি করানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার পরিচয় পেয়ে সে তার প্রতি হিংসা করে। তাই তার সাথে খুব ভালভাবে কথাও বলে না। বরং সে টেলিফোন করলে ঈর্ষায় তার গায়ে জ্বালা দিয়ে ওঠে।

আসলে রুস্মানা দেশে যেতে চায়। সে স্বামী চায় না, তা নয়। সে কোন সময় একাকিত্ব চায় না। সে চায় সকল আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে স্বামীর পরশ। আকাশে কেবল চাঁদ নয়, হাজার নক্ষত্রও চায়।



বিদেশে ফ্যামেলী নিয়ে এলে খরচ বেড়ে যায়। রুস্মানার মন বুঝাতে তার মনোমতো পোশাক-আশাক, অলংকার ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়। তার ফলে দেশে টাকা পাঠাতে দেরী হলে অথবা কম হলে, বাড়ির লোকে সন্দেহ করে বউকে, সেই হয়তো পাঠাতে দেয় না। সে হয়তো শ্বশুরবাড়িতে জমি-জায়গা কিনছে। ইত্যাদি। এইভাবে দুই দিক থেকে শাঁকের করাতে কেটে গুঁড়ো হতে থাকে মুনীরের হৃদয়। বিদেশের জীবন, কেউ পায় ধন, কারো যায় মন। কত হিংসা ছোবল হানে। কেউ বিশ বছর বিদেশে একাকী খেটে মরে, কেউ ঘরে বসে সমান ভাগ চায়। কারো কাছে ভাল হয়, কারো কাছে খারাপ। যাকে যত দিতে পারা যায়, তার কাছে তত হওয়া যায় 'ভাল'। অবশ্যই 'ভাল' হতে টাকা লাগে।

## (৯)

একই মাদ্রাসার একই ক্লাশের ছাত্রী দুই সখী; মুনী (মুনীরা) ও রুনী (রুখসানা)। পড়াশোনায় ভাল ছাত্রী তারা। তাদের মধ্যে আছে দ্বীনী স্পৃহা, কিন্তু গরীব দু'জনেই।

তাদের তফসীরের মাস্টার মশায় খুব পরহেযগার মানুষ। তিনি তাদের দ্বীনী আবেগ-আগ্রহ ও স্পৃহা বাড়িয়ে তোলেন। ভাল সংসার করতে, ভাল ঘর বাঁধতে একটা ভাল মেয়ের দরকার এবং যে ভাল, তার সর্বত্র কদর আছে---এ কথা তিনি খুব বলেন। এমন ভাল মেয়েকে ভাল ছেলে বিনা-পণে বিয়ে ক'রে নিয়ে যায়---এই বিশ্বাস তাদের দারিদ্র্যের দুর্বলতাকে অনেকটা দেবে রেখেছিল। উঠতি যৌবন থেকেই তাদের স্বপ্ন, তাদের মনোমতো দ্বীনদার স্বামী হবে, যে স্বামী তাদের গুণের কদর করবে। যে ভালবাসবে, আর ভাল না বাসলেও তাদের

উপর অত্যাচার করবে না।

একদিন ক্লাশে মুনী মাস্টারকে সলজ্জ কণ্ঠে জিজ্ঞাসাও করেছিল, 'জী! ভাল স্বামী পেতে হলে মেয়েদেরকে কী করতে হবে?

---ভাল স্ত্রী হতে হবে। তবে এটা হল স্বাভাবিক রীতি। অস্বাভাবিক হল ভাল-মন্দের বন্ধন। আর তা অখন্ডনীয় বিধির লেখন। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

---কী দুআ করতে হবে জী?

---'রাব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা অযুর্রিয়াতিনা কুর্রাতা আ'য়ুন।' (অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জোড়া ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর।) আর এ দুআও পড়তে পার, 'রাব্বি আদখিলনী মুদখালা স্বিদ্‌ক্বিঁউ অআখরিজনী মুখরাজা স্বিদ্‌ক্বিঁউ অজ্‌আলনী মিললাদুনকা সুলত্বানান নাস্বীরা।' (অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণকর জায়গায় প্রবিষ্ট কর এবং কল্যাণকর জায়গায় বের কর। আর তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি।)

অবিবাহিত কন্যা ভাসমান মেঘের মত শূন্যে ভেসে বেড়ায়, সে একটা স্থিতি খোঁজে। নিরুদ্দেশ নৌযানের মত মহাসমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বেড়ায়, সে একটা সুন্দর কুল-কিনারা খোঁজে। ভূলুণ্ঠিত লতার মত মাটিতে লুটাতে থাকে, সে একটা মজবুত গাছে জড়াতে চায়। অজানা-অচেনা এক মুসাফিরের সাথে সফর করার পূর্বে মনে সন্দেহ হয়, তাই তাকে ঐ দুআ পড়তে হয়। যাতে তার আগমন ও প্রস্থানস্থল মঙ্গলময় হয়।

মহান আল্লাহর আম নীতিতে আছে, "দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য; সচ্চরিত্র নারী সচ্চরিত্র



পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্র নারীর জন্য (উপযুক্ত)।" কিন্তু এ নীতির উল্লংঘন হয়, এ উপযুক্ততার বরখেলাপ অনেক বর-বধূর বৈবাহিক-বন্ধন কায়েম হয়। তবুও আম নীতির কথা মনে রেখে প্রস্তুতি নিতে হয়। নিজে ভাল, আমার ভালই জুটবে---এই আশাকে মনে প্রবল ক'রে তৈরী হতে হয়। আল্লাহ চাইলে ভালই মিলবে।

তাছাড়া মহান আল্লাহর এই দুনিয়াতে শাস্তি ও পরীক্ষার একটা রীতি আছে। তিনি বালা-মুসীবত দিয়ে অবাধ্য বান্দাকে শায়েস্তা করেন এবং বাধ্য বান্দাকে পরীক্ষা করেন। আর সেই রীতি অনুযায়ী বহু স্বামী নিজ মনোমতো স্ত্রী পায় না এবং বহু স্ত্রী নিজ মনোমতো স্বামী পায় না। আর সেই দাম্পত্য হয় দোযখের একটি শাখাগৃহ। আল্লাহ তোমাদেরকে পানাহ দেন। আমীন।

আরও একটি কথা ওস্তাদ হিসাবে তোমাদেরকে বলে রাখি, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্টিত নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো। অসন্তুষ্ট হয়ে অতিরিক্ত কিছু কামনা করো না। নচেৎ সুখ পাবে না। অতিরিক্ত সুখ কামনা করলে দুঃখ বৈ কিছু পাবে না। তোমরা কবির কবিতা শুনেছ,

'সুখ-দুঃখ দু'টি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তারই ঠাঁই।'

স্বামী যেমনই হোক, তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ো। বিবাহের পর খবরদার অন্যের তুলনামূলক ভাল স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করো না। বরং তোমার স্বামীর চাইতে যার স্বামী নিচু, তার প্রতি লক্ষ্য করো, মনে সান্ত্বনা পাবে, সুখ পাবে।

স্বামীকে তার যথার্থ সম্মান দিয়ো, তুমিও সম্মান পাবে। আর সর্বদা

মনে রেখো, সে তোমার সিজদাযোগ্য জিনিস। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা শির্ক।

খবরদার! তোমার মনের ছাঁচে স্বামীর মনকে গড়তে চেয়ো না। বরং স্বামীর মনের ছাঁচেই তোমার নিজের মনকে গড়ে তুলো। তাহলে দেখবে দাম্পত্য-সুখে তোমাদের ঘর বেহেশতে পরিণত হবে।

স্বামী রোমান্টিক হলে যথাসম্ভব রোমান্টিক হতে চেষ্টা করো। আর বিপরীত হলে বিপরীত। তার মনের বিপরীত চলে যদি নিজের জেদকে বজায় রাখতে অভিমান ও চাপ সৃষ্টি কর, তাহলেই অশান্তির তুফানের দুঃসংবাদ নাও।

অবশ্য এমন পুরুষও আছে, যে স্ত্রীর সকল জেদ রক্ষা ক'রে চলে। সেখানেও শান্তি থাকার কথা। তোমাদের অনেকেই হয়তো এমন স্বামী কামনা কর, যে স্বামী স্ত্রীর কোন কথার অবাধ্য হয় না। কিন্তু জ্ঞানী মেয়েরা এমন স্বামী পছন্দ করে না। যার নিজস্ব ধার-ভার নেই, তাকে কোন্ মানুষ পছন্দ করে?

স্বামী তোমার জান্নাত, স্বামী তোমার জাহান্নাম---এ কথা কখনই ভুলে যেয়ো না। তোমার ওপর তার মর্যাদা আছে, তাও ভুলবার নয়। যে সোহাগ করে, তার শাসন করার অধিকার আছে। এ ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ো না। তুমি স্বামীর দাসী হলে, সেও তোমার দাস। এ দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষই জানতে-অজান্তে কারো না কারো দাস। আর কিছু দাসত্ব আছে, যা বরণ করার চেয়ে অধিক তৃপ্তি অন্য কিছুতে নেই। স্বামী সেবাতে কষ্ট হলেও, সে কষ্টের মত আনন্দ অন্য কিছুতে নেই। অবশ্য স্বামীর কদর জানলে তবে।

তার কদর জেনে নিজের আভিজাত্য গর্ব ও বংশীয় মর্যাদা অথবা



অর্থের অহংকার বর্জন করো।

আর জেনে রেখো, শক্তির চাইতে ভক্তির বাধ্যতা অনেক পবিত্র, অনেক অনাবিল। সকল ডোর অপেক্ষা প্রেম-ডোর অধিক মজবুত, অধিক টেকসই।

## (১০)

মুনী ও রুনী একই সাথে ফারেগ হল। উভয়েরই মনে আশা, ভাল স্বামী পাব, বড় আলেম পাব। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাবে কোন আলেমের খবর আসে না। এ দিকে সংসারের অবস্থা ভাল নয়। মেয়ে ভাল হলে কী হবে? আলেমরা তো বড় লোকের মেয়ে পাবেন। তাঁরা গরীব ঘরের ভাল মেয়ে বিয়ে করতে আসবেন কেন? তাছাড়া তাঁরাও তো যৌতুকের অভিলাষী, রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী।

পক্ষান্তরে ভাল আলেমরাও আলেম ঘর চান। আর তাঁদের সন্ধান মিলা তো সহজ নয়। তাঁদের সংখ্যাও তো কোটির মধ্যে গুটি। আর গরীবের মেয়ের জন্য মাস্টার বা চাকরি-ওয়ালা জামাইয়ের কল্পনা তো ডুমুরের ফুলের মতো।

সুতরাং সাধারণ গরীব গৃহস্থের এই মেয়ে দু'টির আশা দুরাশায় পরিণত হতে চলল। যে স্বপ্ন তারা মাদ্রাসার জীবন থেকে দেখে আসছিল, তা হয়তো ভেঙ্গে যেতে চলল।

বাড়ির লোকেরা চেষ্টা করে, কিন্তু সে আশা-ফুলের মুকুল দেখতেও পায় না।

কিছুদিন পরে রুনীর ভাগ্যে একটি আলেম জুটল। কিন্তু ডিস্কো

আলেম, দাড়ি ছাঁটা আধুনিক আলেম। তার কাছে গান-বাজনা হারাম নয়, ব্যাংকের সূদ হারাম নয়, পর্দায় চেহারা ঢাকা ওয়াজেব নয়। তাও আবার গরীব। আর অধিকাংশ আলেমই তো গরীব। অতএব নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে সে সন্তুষ্ট হতে চেষ্টা করল। শীতল পানির স্থলে গরম পানি পান করলে যেমন শরীরের চাহিদা মেটে, কিন্তু পিপাসা মিটে না, রুনীর দাম্পত্যেরও সেই অবস্থা হল।

রুনীও নিজ স্বামী মারফৎ মুনী-র জন্য একজন আলেম স্বামী খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু কৃতার্থ হল না। অবশেষে তার বিয়ে হল এমন এক ছেলের সাথে, যে বিয়ের মানেও জানে না, স্বামীর কর্তব্য চেনে না, স্ত্রীর অধিকার বুঝে না।

কাজ শেষে বাড়িতে এলে মনে হয়, যেন একজন 'মাতাল' প্রবেশ করল। সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব আনলে তাদের সামনে চা-নাশ্‌তা আনতে বলে। পর্দা মোটেই পছন্দ করে না। বাইরে কাজ করতে বাধ্য করে। সময়মতো নামায পড়তে দেয় না, কুরআন নিয়ে তো বসতেই দেয় না।

অনেক রাত এমন যায়, মুনীকে একাকিনী কাটাতে হয়। অনেক দিন এমন যায়, তাকে না খেয়ে কাটাতে হয়। সারা দিন কাজ করে, তাতে টাকা রোজগার হয়। আর সেই টাকাতে সংসার চলে। কিন্তু অভাব ঘোচে না। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রায় সময় অসুস্থ থাকে, তাদের যথেষ্ট সেবা করে। কিন্তু অনেক সময় তাদের ওষুধের খরচ যোগাতে পারে না।

একদিন তার স্বামী প্রস্তাব নিয়ে এল তাকে বিড়ি বাঁধতে হবে। বিড়ি বাঁধাতে অনেক পয়সা। তাতে তাদের সংসার ভাল চলবে এবং চায়ের দোকানে তারও বেশ বাবুগিরি চলবে।

মুনী সে কাজে রাযী হল না। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, বিড়ি-



সিগারেট খাওয়া হারাম, তা বাঁধাও হারাম, তার মাধ্যমে পয়সা রোযগার করাও হারাম।

সেদিনই ছিল তার স্বামীর সঙ্গে প্রথম সংঘাত। উচ্চ-বাচ্য ও গালাগালি হতে হতে প্রহার পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তাতেও লাভ হল না। পরিশেষে তালাকের ভয় দেখাল, তাতেও মুনী বিড়ি বাঁধতে রাযী হল না। স্বামী রেগে রেগে বলতে লাগল, 'মাদ্রাসায় পড়েছে বলে মুফতী হয়ে গেছে মাগি! এটা হারাম, ওটা হারাম, সব হারাম তো চলবি কী করে? উপার্জন করতে না পারলে মায়ের ঘর থেকে নিয়ে এসে খা।'

কথায় বলে, 'ভাতারে দেখতে না পারলে, রাখালেও ঠেলায়।' মুনীকে আঘাত দিতে তার স্বামীর ভাই ও জায়েরাও একজোট হল।

সীমাহীন আঘাত পেয়ে মুনী মায়ের ঘর চলে গেল। আর তার ফলে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর কষ্ট বেড়ে গেল। সংসারের খরচেও টান পড়তে লাগল। অগত্যায় শ্বশুর-শাশুড়ী একদিন সকালে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। মুনী সামনে আসতেই শাশুড়ী তার মাথা চুম্বন ক'রে বলল, 'মা আমার রাগ ক'রে পালিয়ে এসে বাপ-মাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আমরা জানি মা, তোমার কপাল খারাপ। কিন্তু সেই খারাপ কপালে যে আমাদের ভাঙ্গা কপাল জোড়া লেগেছে মা গো! বড় ছেলে চেয়ে দেখে না, মেজ ছেলেও নিজের বিবি-বাচ্চা নিয়ে পেরেশান। আল্লাহর পর একমাত্র তুমিই আমাদের অবলম্বন মা! তুমি আমাদের মুখ তাকিয়ে বাড়ি ফিরে চল।'

মুনী-র মা মুনীকে বুঝাল। মুনী-র ভাই মুনীকে পাঠাতে রাযী নয়। পরিশেষে মুনী নিজের সিদ্ধান্তে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেল। স্ত্রীর কদর বুঝতে পেরে স্বামী নরম হল। রাতে পরস্পরকে ক্ষমা ক'রে দিল।

মুনী-র স্বামীর এক বন্ধু মুনীকে এক অফিসের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব রাখল। তার স্বামীর কোন বাধা নেই। কিন্তু মুনী-র বাধা আছে। সুতরাং সে সেটাও বর্জন করল। এইভাবে স্বামীর পক্ষ থেকে যখন এমন এমন কাজের প্রস্তাব আসতে লাগল, যে সব কাজে তার নারীত্ব ও সতীত্ব বজায় রাখাই মুশকিল, তখন সে মনে মনে নিরাশ হয়ে পড়ল। একদিন রুনীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত নিল যে, যদি পরের বাড়ি ঝি-গিরি ক'রে খেতেই হয়, তাহলে মান-সম্মান বজায় রাখার জন্য অনেক দূরে গিয়ে কাজ করবে।

রুনীর স্বামী ইতিপূর্বে রুনীকে প্রস্তাব দিয়েই রেখেছিল, তার এক খালাতো বোন সঊদী আরবে বাসায় কাজ করে, সে যেতে চাইলে যেতে পারে। রুনী রাযী হয়নি। এখন মুনী-র কথা শুনে সেই প্রস্তাব বিবেচনা ক'রে দেখল। স্বামী-সংসারে অভাব ঘুঁচাতে এবং নিজেদের বাপ-মা ও ভাই-বোনদের অভাব মোচন করতে সেই কুরবানী দিতে তারা প্রস্তুত হয়ে গেল, যে কুরবানী দিতে সাধারণতঃ স্বামীরাই বাধা দেয়।

## (১১)

মুনী-রুনী দুই বোনের মতো। সুতরাং এজেন্টকে বলা হল, ভিসা যেন এক ঘর অথবা একই শহরের হয়। সৌভাগ্যক্রমে হলও তাই। বুরাইদা শহরের এক উতাইবী পরিবারে কাজ করার জন্য তাদেরকে নির্বাচন করা হল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ক'রে খরচ চুকিয়ে একদিন তারা আকাশে উড়ে সঊদিয়ার বাতাসে পৌঁছে গেল। রিয়ায এয়ারপোর্টের স্পেশাল 'খাদেমাত' রুমে তাদের ঠাঁই হল। এক সময় কাফীল এসে গাড়ি ক'রে তাদেরকে তুলে নিয়ে গেল।



শায়খের দু'টি পরিবার। তিনি মসজিদের ইমাম। তিনি বড় ভাল লোক। কিন্তু মিঞা ভাল হলেই বিবিও ভাল হবে---তার তো নিশ্চয়তা নেই। মুনী-রুনী আরবী পড়েছে, কিন্তু বলতে-বুঝতে মোটেই পারে না। তাই কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য ডাকা হল মহল্লা মসজিদের তাদেরই স্বভাষী বাঙালী ইমাম মুনীর সাহেবকে। শায়খ মুনীরকে তারা ভাল বলেই জানে।

শায়খ কথা বললেন, তাঁর স্ত্রীও পর্দার আড়াল থেকে কথা বললেন, আর মুনীর সে কথার অনুবাদ ক'রে দিতে লাগল। মুনী-রুনীর কথাও অনুবাদ ক'রে তাঁদেরকে শুনাতে লাগল।

শায়খের প্রথম পরিবারের কাছে মুনী থাকবে এবং দ্বিতীয় পরিবারের কাছে রুনী।

সকালে উঠে কার্পেটে 'মিকনাসাহ' মেশিন চালিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। টাইলের উপর ঝাড়ু দিয়ে অথবা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন বজায় রাখতে হবে। যা মুছে পরিষ্কার করার, তা মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

নাশ্‌তার সময় নাশ্‌তা এবং চা-কপির সময় চা-কপি তৈরী করতে হবে। দুপুর ও রাত্রের খাবার পাকাতে হবে।

'গাস্‌সালাহ' (ওয়াশিং মেশিনে) সপ্তাহে একবার মেয়েদের এবং অন্য একবার ছেলেদের কাপড় পরিষ্কার করতে হবে। শুকানোর পর সমস্ত কাপড় আয়রন করতে হবে।

ছোট বাচ্চাদের খাওয়া-পরার দায়িত্বও তাদের উপর থাকবে।

প্রত্যেকের বেডরুম সাজানো-গুছানোর দায়িত্বও তাদের।

বড় বিবির একটি যুবতী মেয়ে বিকলাঙ্গ বিছানাগত, তার দেখাশোনা এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কর্ম মুনীকেই করতে হবে।

যথাসময়ে নামায পড়তে হবে এবং শরয়ী আদবের লেবাসে থাকতে হবে।

কোন প্রয়োজন ছাড়া পুরুষদের মজলিসে (বৈঠকখানায়) যেতে পারবে না।

বিনা অনুমতিতে কারো রুমে হুট্ ক'রে প্রবেশ করবে না।

বিনা অনুমতিতে টেলিফোন ব্যবহার করতে পারবে না।

বাড়ির জানালা থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারা চলবে না।

মজলিসে পুরুষ থাকলে গলা উঁচু ক'রে কথা বলতে পারবে না।

বেতন হবে পাঁচশ' রিয়াল। প্রত্যেক দু'বছর পর দেশে যাওয়ার ছুটি ও টিকিট পাবে।

আরো কত কথা বুঝাতে বুঝাতে তাদের নাম-ঠিকানাও জানা হল। আপোসের পরিচয় হওয়ার পর মুনী-রুনী বলাবলি করতে লাগল, 'এই শ্রেণীর আলেম তারা চেয়েছিল তাদের জীবনে।'

তারা শুনেছে, মুনীর সাহেবের বিয়ে হয়ে গেছে এবং এখানে সস্ত্রীক বাস করে। কোন অফিসে অনুবাদের কাজ করে এবং সেই সাথে ইমামতিও। কাফীল বলেছে, কোন শরয়ী মসলা জানার দরকার হলেও তাকে টেলিফোন ক'রে জানতে পারে।

বিকালেই মুনী রুনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দুই সতীনের ঘর কিন্তু পাশাপাশি নয়, এক মহল্লাতেও নয়। তবে একই শহরে। পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে উভয়ে শুরু করল অন্য এক জীবন। স্বদেশে স্বামী ছেড়ে বিদেশে অর্থ উপার্জন করার জীবন। আর সেই সাথে এমন মানুষদের সাথে সহাবস্থান, যাদের ভাষা বুঝে না, চরিত্র ও ব্যবহার জানে না। সুতরাং আল্লাহই ভরসা।



## (১২)

প্রায় পাঁচ মাস পর এক বাড়িতে দুই সখীর পরস্পর সাক্ষাৎ হল। মুনী খোশ ছিল, রুনী ছিল নাখোশ। ছোট বিবি নাকি বড় খেঁকি মেজাজের। কাজের বড় ভুল ধরে। কোন কাজে দেরী হলে তর সয় না। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলে। অনেক সময় করা কাজকে দ্বিতীয়বার করতে হয়। ধোয়া কাপড় ধুতে হয়। আয়রন করা পছন্দ না হলে আবার আয়রন করতে হয়। বাসায় সবার আগে উঠতে হয়, সবার শেষে শুতে হয়।

মুনী-র কিন্তু তার বিপরীত। তার কপাল ভাল। সে বড় বিবির বাসায় এমনভাবে থাকে, যেন বাড়ির একটা বউ।

দুনিয়ার সংসার এই রকমই। কারো দুধে চিনি, কারো শাকে বালি। বিদেশে বাসার কাজে কোন হাউস ড্রাইভার থাকে বাড়ির কুকুর-বিড়ালের মত। পক্ষান্তরে অনেকে থাকে ঘর-জামাইয়ের মত। যার যেমন ভাগ্য।

অনুরূপ বাড়ির দাসীদের মধ্যেও কেউ থাকে বাড়ির কুকুর-বিড়ালের মত, আবার কেউ থাকে বউ হয়ে। প্রবাসের জীবনে প্রত্যেক প্রবাসীকে তাই মেনে নিতে হয়। অনেকের কাছে পরবাস বনবাসের মতো, আবার অনেকের কাছে দেশ-ভ্রমণের মত।

পরবাস নিয়ে মুনী-রুনী কত কথা বলতে লাগল। এমনকি গোপন কথাও। কথায় কথায় রুনী বলল, 'ছোট বিবির মেজ ছেলেটা চরিত্রহীন। সে মাঝে মাঝে তাকে উত্যক্ত করে। বাড়ির ড্রাইভারও তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। ওদিকে মুদীকে টেলিফোনে মালের অর্ডার দিলে, সে দরজার গোড়ায় মাল দিয়ে পয়সা নিতে এসেও তাকে কুপ্রস্তাব দেয়।

আর এই জন্যই ভাল মেয়েরা পরের বাড়ি ঝি-গিরি করতে যায় না এবং বিশেষ ক'রে এ কাজে বিদেশ আসতে চায় না। কিন্তু আমরা পেটের দায়ে আমাদের অযোগ্য স্বামীদের সংসার চালাতে আসতে বাধ্য হলাম।'

কথাগুলি বলতে বলতে রুনীর চোখ দু'টি পানিপূর্ণ হয়ে উঠল। টিসুতে চোখ মুছে সে আবারও বলতে লাগল, 'আমাদের দেশের কত লোক পেট পুরে দু'বেলা খেতে পায় না। আর এখানে অর্ধেক খাওয়া, অর্ধেক ফেলা; বরং তারও বেশি। ভাল চালের ভাত ও এত এত মাংস 'কীস' (প্লাস্টিকের ব্যাগ)-এ ভরে 'বালাদিয়ার' (পৌর-সভা)র ডিব্বায় ফেলতে এত মায়া লাগে! এই ফেলা খাবারগুলো দিয়ে আমাদের দেশের গরীবদের দিন চলে যেত।'

মুনী বলল, 'আরও একটি আশ্চর্যের ব্যাপার আছে এদের পার্টিতে। এরা গোটা গোটা ছাগল ভুনে বড় বড় প্লেটে ভাতের ওপর রাখে। তার চার পাশে সাজানো থাকে ফলফ্রুট, পেপসি, দই, পানি ইত্যাদি। সবার আগে প্রথম পর্যায়ের মেহমানরা বসে খেয়ে উঠে যায়। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ের মেহমানরা খেয়ে উঠে যায়। তারপর ঐ প্লেটেই মেয়েদের খাওয়ার পালি আসে। আমি এক পার্টিতে গিয়ে এঁটো পাতে এঁটো খাবার খেতে পারিনি। কিন্তু আমাদের বড় বিবি ও তার মেয়েরা রুচির সাথে আহার করল। আমাকে খেতে বললে, আমি একটা ওজর দিয়ে সে রাতে না খেয়ে থেকে গেলাম। তারপর আবার মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেলে অতিরিক্ত খাবারগুলো প্লেটসহ পাড়ার গরীবদের বাড়িতে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল এবং সবাই নিয়েও নিল! আর আমাদের দেশ হলে তা গ্রহণ তো করতই না, উপরন্তু কত কথা হত।'



রুনী আবার বলতে লাগল, 'মাঝে মাঝে পুরুষরাও তাকে খ্যাকখ্যাক করে। কথা বুঝতে না পারার জন্যও অনেক সময় 'নটখট' হতে থাকে। আর তখন দরকার পরে মুনীর 'মুত্বাওয়া'কে। সেই বুঝিয়ে-পড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়ে যায়।'

মুনী-র বাসাতেও অনেক সময় দরকার পরে মুনীরকে। আর এইভাবে মুনী-রুনী ও মুনীরের মাঝে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের সকলের মনে এক প্রকার প্রণয়ের রিনিঝিনি বাজনা বাজতে থাকে।

রুনীর সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভালই আছে। কিন্তু মুনী-র সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক ভাল আগেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। কাফীল উভয়কে মোবাইল দিয়েছে, বাড়িতে কথা বলার জন্য।

এমনিতে স্বদেশ থেকে বিদেশের ফোনের কথাবার্তায় 'টাকা পাঠাও' শব্দটাই বেশী থাকে। মিস্‌ড-কলে দেশের নম্বর দেখলেই মনে হয় টাকার দরকার পড়েছে। আত্মীয়তা ও প্রেম-বন্ধন নিয়ে যে কথা হয় না, তা নয়। তবে তুলনামূলক কম।

রুনীর স্বামী টাকা প্রার্থনার সাথে প্রেম প্রার্থনা করলেও মুনী-র স্বামী কেবল টাকাই প্রার্থনা করে। যেহেতু মুনী-র চাহিদা হয়তো মিটেই যায়, যা মিটে না, তা হল টাকার চাহিদা।

টাকা পাঠানো নিয়ে মোবাইলে স্বামীর সাথে তার বচসাও হয়। পর্যাপ্ত টাকা পাঠাতে না চাইলে স্বামীর অধিকার স্মরণ করায়। বলে, 'আমি তোমাকে ছেড়ে কষ্ট ক'রে দিন-যাপন করছি টাকার জন্যই তো। টাকা না পাঠালে তুমি দেশে ফিরে এসো।'

মুনী বলে, 'দেশে ফিরে গেলে তুমি কি আমাকে কামাই ক'রে

খাওয়াবে? আর তা পারলে তো আমাকে বিদেশে ঝি-গিরি করতে আসতে হতো না।'

স্বামী গালাগালি করে, পরপুরুষের সাথে গোপন প্রেমের অপবাদ দেয়। মুনী সবই নীরবে সহ্য করে, কাঁদাকাটি করে। কখনও কখনও সেই তিক্তময় দাম্পত্যের কথা মুনীরকে অকপটে জানায়। মুনীর মনে মনে দুঃখ পায়, তাকে সান্ত্বনা দেয়।

এক সময় মুনী তার স্বামীকে জানিয়ে দেয়, 'আমার এর বেশী টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন মনে করলে তুমি আমাকে তালাক দাও।'

'ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।' এমন স্বামীর বাঁধনে নিজের জীবনকে বেঁধে রেখে সে অর্থ নষ্ট কেন করবে? সে দেশে গিয়ে নিজে খোলা তালাক নেবে কি না, সে বিষয়েও পরামর্শ করে মুনীরের সাথে। তার ইচ্ছা, সে তাকে এখানে গ্রহণ করুক। কিন্তু সে তো বুঝে না মুনীরের পরিস্থিতি।

মুনীর যেমন স্ত্রী পেয়েছে, তার চাইতে কথাবার্তা ও ব্যবহারে অনেক ভাল মুনী। মুনীরও কামনা করে এমন স্ত্রী পেতে। কিন্তু সে পাওয়ার পথ কি এতই সহজ?

তার উপরে আর এক জ্বালা বাদরিয়্যার। সে বিকলাঙ্গ হলেও তার মন বিকলাঙ্গ নয়। তার দেহে অসূর্যম্পশ্যা রূপসীর যৌবন আছে, মনে আবেগ-ভরা প্রেম আছে। সেও ভালবাসতে চায়। সে জানে, তাকে কেউ বিয়ে করবে না। যে বিছানায় পাশ ফিরে শুতে পারে না, তাকে আবার কে বিয়ে করবে? কিন্তু মনকে সে বেঁধে রাখতে পারে না। বয়স হল ভরা যৌবনের। সেও মনের কাছে পেতে চায় একজন পুরুষকে। মুনী গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে আরও পাকিয়ে তুলেছে। যৌন-কাহিনী শুনিয়ে



যৌবনের আগুনে বারবার ফুঁ দিয়েছে। সেই আগুনে ঘৃতাহুতি করেছে।

কথায় কথায় মুনীর মুত্বাওয়ার প্রশংসা করেছে। আর সেই প্রশংসার মৃদু দংশনে তার শূন্য হৃদয়ে জ্বালা শুরু হয়েছে। সুতরাং সেও মাঝে মাঝে নানা ছলে মুনী-র মোবাইলে মুনীরের সাথে কথা বলে। নিরাশ মনের আশাব্যঞ্জক হাসি শোনে ও শোনায়।

তাতে বাদরিয়্যা যেন পঙ্গু জীবনে অন্য এক নতুন জীবনের সন্ধান পায়। তার হৃদয়ের মরা গাছের ডালে ডালে ফুল ফোটে। বাড়ির পাশে মসজিদ। সেই মসজিদে শায়খ মুনীর নামায পড়লে রাত্রে মাইকে তার ক্বিরাআত শোনা যায়। কান খাড়া ক'রে মন-প্রাণ দিয়ে শোনে। তার কুরআনে কোন্ সুর লুক্কায়িত আছে, তা ধরার চেষ্টা করে। আল্লাহর ভয় ও আবেগভরা কণ্ঠে তার ক্বিরাআত শুনেই বিমোহিত হয় বাদরিয়্যা। মুনীর আরাবী নয়, তাও এত ভাল কুরআন পড়তে পারে? সে আরাবী না হলেও আরবানী অবশ্যই। আজমী হয়েও আরাবীর মত আরাবী সমাজে ইমামতি করার যোগ্যতা নিশ্চয় তার আছে।

কোন কাজে বাইরে গেলে এবং নামাযের শব্দ অন্য কারোর পেলে বাদরিয়্যা উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ওঠে। সাথে সাথে মুনীকে জিজ্ঞাসা করে তার কথা। তাকে মোবাইলে যোগাযোগ করতে বলে। অতঃপর নিজে কথা বলে তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে।

যেদিন মসজিদের মুআয্যিন থাকে না এবং মুনীর আযান দেয়, সেদিন বাদ্‌রিয়্যার আনন্দ গায়ে ধরে না। মুনীরা কাছে না থাকলে তাকে ডেকে বলে, 'ঐ শোনো, মিনার থেকে মুনীরের আযান। কি মিষ্টি সে আযানের সুর!' উভয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনে তার জবাব দেয়।

মুনীও মুনীরের মনের গভীরে আসতে চায়। ওদিকে নূরীও

সুযোগমতো মুনীরকে টেলিফোন ক'রে নিজ মনের অব্যক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করে। তার দেহ থাকে আফতাবের কাছে, আর মন থাকে মুনীরের কাছে। এ যেন মুনীর নয়, বদরে মুনীর (আলোময় পূর্ণিমার চাঁদ)। তার সৌন্দর্যময় আকর্ষণে যেন ওদের হৃদয়-সমুদ্রে জোয়ার আসে।

মুনীর বাসায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা অনুভব করে, তত তাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। তবুও আলেম তো। তাই সে আকর্ষণ তুফান আনতে পারে না।

## (১৩)

মানুষের জীবনে অনেক এমন কষ্ট আছে, যা সারা জীবন বরণ করার মাধ্যমেও সুখের তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকার করতে মুনীরের স্ত্রী রুম্মানা চায় না। বাসায় অনেক সময় একা থাকতে হয় বলে তার বড় কষ্ট হয়। প্রবাস বলে কথা, প্রবাসে কি কেউ পরম শান্তি পায়? তবুও 'স্বামী-সুখে বনবাস' যাদের বিশ্বাস, তারা তো বেশ সুখেই কালাতিপাত করছে। কিন্তু রুম্মানা পারছে না। সে ভরা ঘরে নানা হৈচৈ ও আমোদ-প্রমোদের মাঝে মানুষ হয়েছে, এখানে একা হয়ে যাওয়াতে তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সঊদী ফ্যামেলীরা কোন প্রবাসীদের ফ্যামেলীর সাথে আসা-যাওয়া করে না। মাঝে-মধ্যে বাঙালী-হিন্দী ফ্যামেলীর আসা-যাওয়া আছে। কিন্তু রুম্মানা এক আলাদা ধরনের মেয়ে। সে সবারই সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না।

তার ঝোঁক, সে দেশে যাবে, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বাস করবে।



আবার একা যাবে না, মুনীরকেও যেতে হবে এবং সেখানেই চাকরি করতে হবে। বেতন কম হলেও শুকনা রুটি খেয়ে গাছ তলায় পড়ে থাকবে, তবুও এ বিদেশে পলান্ন খেয়ে প্রসন্ন থাকবে না।

মাঝে মাঝে বড় জেদ ধরে। দেশের কথা মনে পড়লে অথবা চিঠি এলে অথবা ফোন এলে সারাদিন স্বজনদের চিন্তায় আকুল থাকে। সঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠে না, ঘুমুতে খুব পছন্দ করে, যথাসময়ে রান্নাবান্না করে না। আর তাতে মুনীরের ক্ষতি হয়, মেজাজ খারাপ হয়। যেহেতু তাকে তো যথাসময়ে ডিউটিতে যেতে হয়। কিন্তু সে যথাসময়ে খেতে পায় না এবং ঠিক সময়ে বিশ্রাম ও প্রয়োজন মতো ঘুমাতে পায় না।

টাকা-পয়সার মায়া করে না। যথেষ্ট অপচয় করে। ফ্রিজে পড়ে থেকে অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, অনেক রান্নাকৃত জিনিসও ফেলতে হয়। আপত্তি করলে রাগ হয়। আর হোটেল থেকে খাবার আনার নাম শুনলে আহ্লাদে আটখানা হয়।

মেয়েদের বেশি রাগ-অভিমান থাকলে সংসারে শান্তি থাকে না। স্বামী তার মন রক্ষা না করলে নাকে কাঁদা, স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা পড়লে পা ঠোকা, ঘটি-বাটি ঠোকা, মুখ নামানো ইত্যাদি সংসারের সুখ হরণ ক'রে ফেলে। আর রোমান্টিক মনের স্বামী হলে, তার জীবন মরুময় হয়ে ওঠে। পরন্তু যে পুরুষরা একটি দাসী পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে এবং যে মহিলারা দুটো ভাত-কাপড়ের জন্য স্বামীর সংসার করতে আসে, তাদের কাছে প্রেম-ভালবাসা ও রোমান্সের কি মূল্য আছে?

জেদী মেয়ে কখনও জেদ ধরে, দেশে না গেলে নূরীদের মতো প্রত্যেক বছর দেশে যেতে হবে। কিন্তু সে খরচ কোথায় পাওয়া যাবে? আফতাব কোম্পানি থেকে প্রত্যেক বছর টিকিট পায়। মুনীর তো পায় না।

সুতরাং প্রত্যেক বছর দেশে গেলে টাকা-পয়সা 'বাড়ে পরে ঢোরে খায়'-এর মত অবস্থা হবে। ভাতের চাউল চর্বণে যাবে।

অবুঝ মেয়ে, বুঝ মানে না। অনেক সময় উল্টা বুঝে। কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি মানে না। জাহান্নামকেও ভয় করে না। কারো উদাহরণ সহ্য করে না। একদা মুনীর উদাহরণ স্বরূপ বিবি রহিমার কথা বললে, উত্তরে সে বলল, 'তুমি আগে আইয়ুব নবীর মতো হও, তাহলে আমি বিবি রহিমার মতো হব!'

একদা মা আয়েশার কথা বললে, উত্তরে বলল, 'তুমি কি নবী মুহাম্মাদ নাকি, তাই আমি আয়েশার মতো হব?'

মুনীর বলে, 'মনে কর, আমি ফিরাউন। কিন্তু তুমি আসিয়া হলে দোষ আছে কি?'

রুম্মানা সেই শ্রেণীর স্ত্রী নয়, যাকে স্বামী 'এটা কেন করলে' প্রশ্ন করলে বলে, 'ভুল হয়েছে।' বরং সে বলে, 'বেশ করেছি।' সে সেই জাতের মেয়ে নয়, যাকে স্বামী 'এটা কেন করলে না' প্রশ্ন করলে বলে, 'আচ্ছা করছি।' বরং বলে, 'অত পারি না।' ভুল ক'রেও সে ভুল স্বীকার করতে জানে না। কারণ, আভিজাত্য গর্ববশে সে ভাবে, সে যেটা করে, সেটাই ঠিক।

দিনে-রাতে সে শুধু নিজের হিসাবটাই দেখে। সে কী পায়নি, তার হিসাব দেখায়। কিন্তু কত কী পেয়েছে, তার হিসাব দেখে না।

তার অরগুণ নেই, বরগুণ আছে। পচা আদা, ঝালে গাদা। ভুল করে, আবার মুখও চালায়। কুঠে মুরগীর ঠোঁটে বল খুব।

কোন বিষয়ে তর্ক করলে স্বামীর কাছে হারতে চায় না সে। যেহেতু তার সাতগুষ্টি আলেম। সে ভাবে তার স্বামীর চাইতে তার বাপ-ভাইরা



বেশি বড় আলেম। অতএব সে বেশি জানে। তাই ধার-করা বুদ্ধিতে তর্কে হেরে সে ছোট হতে চায় না।

এক গ্রামের মোড়ল খাসি কিনে নিয়ে এসে বলতে লাগল সে হরিণ কিনে এনেছে। লোকে বলল, 'মোড়ল মশায়! এটা তো হরিণ নয়, খাসি।' মোড়ল বলল, 'না, এটা হরিণ। যে প্রমাণ করতে পারবে এটা খাসি, তাকে আমি দিয়ে দেব।'

তার বাড়ির লোকে বলল, 'এ তো সবাই প্রমাণ ক'রে দেবে!' মোড়ল বলল, 'অসম্ভব।'

সুতরাং একজন এসে বলল, 'এটার পা এমন, কান এমন, চোখ এমন, শিং এমন, অতএব এটা হরিণ নয়, খাসি।'

মোড়ল বলল, 'না, এটা হরিণ।'

আর একজন এসে বলল, 'এর গঠন হরিণের মতো নয়, এর শিং-দু'টি হরিণের মতো নয়, এর চোখ দু'টি হরিণের মতো নয়, অতএব এটা খাসি।'

মোড়ল বলল, 'না, এটা হরিণ।'

এইভাবে কতরূপে শতভাবে প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও মোড়ল বলে, 'না, এটা হরিণ।'

সুতরাং প্রমাণ না মেনে তাকে খাসি হারাতে হল না। রুম্মানাও তেমনি মুনীরের নানা যুক্তি-প্রমাণ না মেনে নিজের জেদ হারায় না, তর্কে হারে না। আপোস করতে গেলেও সেই 'আপোস মানব, তবে তালগাছটি আমার'-এর মত ব্যাপার তার।

সে মানুষ অঙ্কের হিসাব কেন মানবে, যে আগে থেকেই বিশ্বাস করে যে, দুই আর দুইয়ে পাঁচ হয়?

রুম্মানা মানে বেদানা। তার রূপের সাথে নামের অনেকটা মিল থাকলেও টকে একটু বেশী। আর সে সাইজেও ছোট। তাই ছোট ধানি লঙ্কার মতো তার তেজও খুব বেশী।

একদিন রাতে বিছানায় বচসা হতে হতে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, মুনীর পুরুষ হয়েও কাঁদতে লাগল। সে রাত্রে সে আর বিছানায় গাত্র রাখেনি। বরং সারা রাত্রি 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল' এবং দুআয়ে ইউনুস পড়তে পড়তে ফজর করল!

কিন্তু তাহলে কী হয়? চোখের পানি যাকে ফেলতে হয়নি, সে কি কোনদিন অপরের চোখের পানির মর্যাদা দিতে পারে?

এ কথাও সে ভাবল না যে, পুরুষ কাঁদে না। কিন্তু যখন কাঁদে, তখন তার কাঁদনে রক্তাশ্রু ঝরে।

মাঝে মাঝে ঠোঁটকাটা রুম্মানা মুনীরকে বিয়ে করতেও বলে। হয়তো বা তা পারবে না বলেই বলে। অনেক সময় তালাকের কথাও তোলে। কিন্তু আভিজাত্য গর্ব ও অহংকার তাকে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল যে, তালাক হলেও সে যেন কোন কিছুর পরোয়া করে না।

চটরাগী হতভাগীর কথার বিঁধুনির জবাব দিতে মুনীরের যে হাত ওঠে না, তা নয়। তবে চিৎকার ও কান্নার ভয়ে অনেক সময় বিরত থাকতে হয়।

সধবা স্ত্রী অলংকার পরে না। বলে, 'ভাল লাগে না, বিরক্ত লাগে, ভারী লাগে।'

কোন প্রকারের সাজ-গোজ করে না। এক বিছানায় শোয় না। বলে, 'গায়ে গা ঠেকলে ঘুম আসে না। গরম লাগে। তোমার নাক ডাকলে ঘুম ভেঙ্গে যায়, বিরক্ত লাগে।' ইত্যাদি।



স্বামীর যৌন-সুখের ব্যাপারে কোন প্রকার আগ্রহ দেখায় না। নানা অসীলায় কেবল পাশ কাটতে চায়। নীরস জীবন স্বামীর জীবনকেও রসহীন ক'রে তোলে।

শ্বশুর-বাড়ির লোকে বলেছিল, 'বয়স চাপলে ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু বয়স চাপলেও যেন সে আরো অবুঝ হয়ে যায়। আসলে 'হয় যে, সে নয় বছরেই হয়, না হলে নব্বইতেও নয়।' মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির পরিবর্তন তত সহজ ব্যাপার নয়। কথায় বলে, 'টাক প্রকৃতি গোদ, মরণে হয় শোধ।' 'স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত যায় না ধুলে।'

আর ডাঁট-ধমকেও কিছু লাভ হয় না। গাধা পিটিয়ে কি ঘোড়া করা যায়? পিতল পুড়িয়ে কি সোনা করা যায়?

মুনীর কত শত সুখ পেয়েছিল, যদি তার সুখের সাথীটা মনোমতো হত। কিন্তু সুখের এ দুনিয়া এত প্রশস্ত হয়ে লাভ কী, যদি তার পায়ের জুতাটাই সংকীর্ণ হয়?

ধীরে ধীরে রুম্মানা মুনীরের গলায় আটকে পড়া মাছের কাঁটা হয়ে গেল, যে গলার নিচেও যেতে চায় না, বাইরেও বের হয় না। নাম করা আলেমের মেয়ে বলেই তালাক দেওয়া তারও প্রেস্টিজের ব্যাপার ছিল। লোক-সমাজকে রুম্মানার ভয় না থাকলেও, মুনীরের ছিল। সুতরাং সেই কাঁটার ব্যথা দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগল। নামাযে নামাযে স্ত্রীর মৃত্যু-কামনা করতে লাগল। কিন্তু তাতে কী হয়? আল্লাহর হিকমতকে সে উল্লংঘন করতে পারে না। আর রুম্মানার মতে, 'শকুনির বদ্দুআতে ভাগাড়ে গরু পড়ে না।'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বামী ভ্রষ্ট হয় অথবা দ্বিতীয় বিয়ে করে, স্বভাবে, নচেৎ স্ত্রীর গুণ-অভাবে।

## (১৪)

মহান আল্লাহ কোন কোন বান্দাকে পরীক্ষা করেন। যে সকল বিষয়-বস্তু দ্বারা তিনি পরীক্ষা করেন, তার মধ্যে স্ত্রীও একটি। তার সুগভীর প্রেম-ভালবাসা দ্বারা যেমন স্বামীকে পরীক্ষা করা হয়, তেমনি তার ঘৃণা ও তুচ্ছজ্ঞান দ্বারাও তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়। মুনীর পড়েছিল শেষোক্ত পরীক্ষায়। যদি না সে বাইরে সান্ত্বনা ও প্রবোধ পেত, তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যেত।

মুনী ও বাদরিয়্যা সান্ত্বনা দেয়। উপহাস-ছলে তার মন খোশ ক'রে দেয়। নামাযে ক্বিরাআত ভুল হলেই বাদরিয়্যা ফোনে বলে, 'আজ নিশ্চয় বউয়ের সাথে আপনার কিছু হয়েছে!'

অনেক কথা মুনীর গোপন করে। কিন্তু সব কথা মনের মানুষদের কাছে গোপন করতে পারে না। তবে মিথ্যা বলার অভ্যাস তার নেই, যেমন তার বিবি রুম্মানার আছে।

মহান আল্লাহ তার প্রতি অনেক পরীক্ষা ও অনুগ্রহ করেছেন। ছোটবেলায় সে দারিদ্র্যের অভাব-অনটনের পরীক্ষা দিয়েছে। বোম্বাইয়ে নূরীদের অনুগ্রহ লাভ করেছে। আল-ক্বাসীমে রাখালির পরীক্ষা সে দিয়েছে। পরবর্তীতে মাশায়েখদের অনুগ্রহ লাভ ক'রে সে বড় মর্যাদা লাভ করেছে। বিয়ে করা বউয়ের অপমান সহ্য করার মত পরীক্ষা সে দিয়ে চলেছে। এবার সে অন্য এক স্ত্রীর অনুগ্রহ লাভ করতে চলেছে।

একদিন বাদরিয়্যা দাসী-সখী মুনী-র সাথে মুনীরের কথা আলোচনা করতে করতে বলেই ফেলল, 'মুনী! তুমি আমাকে একটু সহযোগিতা



করবে?'

---আমি তো তোমার সহযোগিতার কাজেই নিযুক্ত আছি বাদরিয়্যা!

---না, সে অন্য ধরনের সাহায্য। আমাকে সরাসরি বলতে লজ্জা লাগছে, তুমি বলে দাও না, মুনীর যেন আমাকে বিয়ে করে। আমি দুনিয়ার বুকে স্বামীর বাঁধনে থেকে মরতে চাই। যাতে আখেরাতে আমি তাকে পাই।

---তুমি বিয়ে করবে? তুমি স্বামী নিয়ে কী করবে? তোমার তো নড়া-সরা করারই ক্ষমতা নেই।

---আমি ওসব কিছু চাই না মুনী! আমি কেবল চাই স্ত্রীর মর্যাদা। আমি যেন বলতে পারি, আমার জোড়া আছে, আমার স্বামী আছে। আমি আলোক-লতা হয়ে গাছে জড়াতে চাই না। আমি ভুঁই-লতা হয়ে গাছের অবলম্বন পেতে চাই। আমি চিরদিন ভূমিতে লুটিয়ে থাকতে চাই না মুনী!

---কিন্তু মুনীর মুত্বাওয়া তোমাকে আবার বিয়ে করবে কেন? তার তো বউ আছে।

---থাকলেই বা। দ্বিতীয় বিয়ে কি করতে পারে না? আমার আব্বা এবং আরও অনেকে কি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিয়ে করেনি?

---সে কি তোমার খরচ যোগাতে পারবে?

---না-না, আমি তার কাছে কিচ্ছু চাই না। মোহর চাই না, খোরপোষ চাই না, বাড়ি ও গয়না চাই না, একটি হালালাও চাই না। তার বাসায় যেতেও চাই না। আমি কেবল চাই, সে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে। মাঝে-মধ্যে আমার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে আমার মনকে সুখী ক'রে যাবে।

---যদি তোমার গর্ভে সন্তান চলে আসে?

---না আসার ব্যবস্থা ক'রে নেব। তবে আমার মনে হয়, আমার গর্ভ-সঞ্চার হবে না।

---ডাক্তার বলেছে?

---হ্যাঁ। আর তুমিও তো জানো, আমার নামায-রোযা কাযা হয় না।

---কিন্তু তোমাদের দেশে তো কোন বিদেশীকে বিয়ে করা নিষেধ।

---হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু শর্ত-সাপেক্ষে করতে পারা যায়। বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, বিবাহের বয়সোত্তীর্ণ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি মহিলারা প্রবাসীকে বিবাহ করতে পারে। আসলে আমরা আরবরা বংশ-গর্বিত মানুষ। তাই বাইরে জগতের সাথে মিশতে চাই না। তাছাড়া আমরা মনে করি, আকীদার দিক থেকে আমরাই সবার চেয়ে ভাল মুসলমান। তাই অপরের আকীদায় সন্দেহ পোষণ করি। দেশের ভিতরেও অনেক পরিচিত বংশের লোকেরা বংশ-পরিচয়হীন ছেলে-মেয়ে গ্রহণ করে না।

---তাহলে তুমি করছ কেন? তুমি তো তামীমী বংশের মেয়ে।

---আমি মনে করি, বংশের চাইতে ঈমানী-পরিচয়ই বেশী জরুরী। আল্লাহর কাছে যে ভাল, সে আমার কাছেও ভাল। মুনীর কি ভাল লোক নয়? সে কি মুত্বাওয়া (পরহেযগার) নয়?

---অবশ্যই। কিন্তু তোমার বাড়ির লোক রাযী হবে তো?

---আমার আব্বা-আম্মা রাযী হলেই হবে। আর অন্য কেউ জানতেও পারবে না আমাদের বিয়ে। আমাদের দেশে মোহর বেশী হওয়ার কারণে মেয়েদের বিবাহ-সমস্যা দেখা দেওয়ায় 'মিস্য়ার' নামক এক প্রকার গুপ্ত বিবাহ-প্রথা চালু হয়েছে। আমি সেই প্রথাতেই মুনীরকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে চাই। যদিও অনেক উলামা বলছেন, ঐ বিয়ে বৈধ নয়। কিন্তু অনেকের নিকট তো বৈধ।



বাদরিয়্যা এক বিছানায় শুয়ে থাকে। সঙ্গের সঙ্গী বলতে ঐ মুনীই। মুনী তার মনের মতো বন্ধু। আর সে না থাকলে টিভি আছে রুমের অপর প্রান্তে। তার হাতের কাছেই আছে তার রিমোট। টিভি থেকেই সে দেশের অনেক হালচাল, সমস্যা ও সমাধান জেনে থাকে।

আব্বা-আম্মার মত নেওয়ার আগে বাদরিয়্যা মুনীরের মত জানতে আগ্রহী হল। সে নিজে না বলতে পেরে মুনীকেই মোবাইল লাগাতে বলল। বাদরিয়্যা তো বাংলা বোঝেই না। তার সামনেই রুম বন্ধ ক'রে মুনী ফোন করল মুনীরকে।

কুশল জিজ্ঞাসার পর সে সলজ্জ কণ্ঠে বলল, 'একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু বলতে ভয় ও লজ্জা লাগছে।'

---আরে! আমাকে লজ্জা ও ভয়? নির্ভয়ে লজ্জার দেওয়াল ভেঙ্গে বলে ফেল।

---আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। এখানে নয়, দেশে।

---কিন্তু আমার বউ আছে, তোমারও স্বামী আছে, তাহলে?

---আমি তালাক নেব। আপনিও তালাক দিয়ে দিন। আপনার বউ তো ভাল নয়। আপনাকে কষ্ট দেয়।

---এটাই আমার তকদীরে ছিল। তা বলে কি তালাক দেওয়া হবে?

---আপনি ওর বাপ-ভাইদেরকে ভয় করছেন।

---আর সমাজকেও। আমাকে তো সমাজ নিয়ে চলতে হয়।

---বাইরে সমাজ নিয়ে ভাল হয়ে চলবেন, আর ভিতরে বউয়ের গুঁতুনি খাবেন?

---এটাই আমার কপাল।

---তাহলে তালাক দিতে হবে না, আমাকে পৃথক একটা ঘর বানিয়ে

দেবেন।

---সে ক্ষমতা আমার থাকলেও সমাজ ভাল মনে করবে না। সঊদী আরবে তিন-চারটে বিয়ে করা কোন দোষের নয়, কিন্তু আমাদের দেশের পরিবেশ তো তুমি জান, যে দু'টো বউ রাখে, লোকে তাকে কত খারাপ ভাবে। তুমি বরং অন্য আইবুড়া পাত্র দেখে নাও। আমি নিজেও দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব।

---দেশের পরিবেশে কেউ বউ থাকতে একাধিক গার্লফ্রেন্ড রাখলে দোষের নয়, উপপত্নী ব্যবহার করলে দোষের নয়, দোষের হল একাধিক বিবাহ করা। ভেঙ্গে ফেলুন এমন সমাজের বেড়া। থুথু মারুন এমন সমাজের গায়ে।

---তুমি হয়তো নিজের সুখ কামনা ক'রে এ কথা বলছ। বল তো, এ কথা কি রুম্মানা ও তার পরিজনরা বলবে?

---আর আমি ও আমার পরিজনরা কী বলবে বলুন? আমার জীবনটার কথা ভেবে দেখেছেন? আমাকে কোন্ অবিবাহিত যুবক বিবাহ করবে? যেখানে অবিবাহিত যুবতীদের বিবাহ কঠিন, সেখানে কি এই তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা যুবতীদের বিবাহ সহজ হবে? আর সেখানে কি একাধিক বিবাহ যুক্তিযুক্ত নয়?

---একাধিক বিবাহের একাধিক শর্ত আছে মুনী! আমার ভয় হয়, আমি সে সব শর্ত পালন করতে না পেরে গোনাহগার হয়ে যাব। সতীনে-সতীনে ভাব না থাকলে সুখের অভাব হবে সেই সংসারের নিত্য স্বভাব।

---সুপুরুষদের সে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আছে।

---আমাকে পুরুষই থাকতে দাও। সুপুরুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখাও না



মুনী! কিন্তু যে ভাগ্যবান তোমাকে পাবে, সে অবশ্যই সুপুরুষ, সে বড় সুখী হবে।

---পরের বাড়ির ঝি-কে কোন্ ভাগ্যবান আর বিয়ে করবে বলুন?

---এ কথা বলে নিজেকে ছোট করো না মুনী? নর্দমায় থাকলেও যে মণি-মুক্তা চেনে, সে নর্দমা থেকেই তুলে নেবে। যখন জানবে, তুমি শুধু মুনী নও, মণিও, তখন সে তোমাকে গলার হার বানাবে।

---বখীলের বুক, আর কোকিলের মুখ?

---দান করার মত কিছু না থাকলে, কী দান করি বল?

---বেশ তাহলে আর একটা প্রস্তাব রাখি।

---তোমার বিল উঠছে, আমি রিটার্ন করছি।

---না-না, অসুবিধা নেই। বাদরিয়্যা বিল দিয়ে দেবে। আর প্রস্তাবটা ওরই।

---ওর আবার কী প্রস্তাব?

---ও আপনাকে বিয়ে করতে চায়?

---আরে! ওকে নিয়ে আমি কী করব?

---না-না, আপনাকে নিতেও হবে না, দিতেও হবে না। ও শুধু আপনার কাছ থেকে স্ত্রীর মর্যাদা পেতে চায়, তার মানে আইবুড়া নাম ঘুচাতে চায়। ঐ যে 'মিস্য়ার' না কী বিয়ে বলছে, সেই বিয়ে করতে চায়।

---তোমার কী রায়?

---ভাল হবে। আমাকে নিরাশ করলেও ওর আশাটা পূরণ করুন। ও একজন গত্যন্তরহীন মেয়ে। ওকে তো অন্য কেউ বিয়ে করবে না।

---দেখতে কেমন?

---সুখের ঘরে রূপের বাসা। আরবের ডানাকাটা পরী। কিন্তু

বিছানাগ্রস্ত। তবে অসুবিধা হবে না।

---ওর মা-বাপ কি রাযী আছে?

---আগে আপনার সম্মতি, তারপর ও মা-বাপের অনুমতি নেবে।

---আমাকে ভাবতে দাও মুনী! এ আমার কী কপাল?

---কপালে অবুঝ রুম্মানা, না হয় বাঁদী মুনীরা, না হয় বিকলাঙ্গ বাদরিয়্যা। কোনটাই আপনার উপযুক্ত নয় বলুন।

---তা বলছি না। আসলে যা চাই, তা ভুল ক'রে চাই। আর যা পাই, তা চাই না। রবি ঠাকুর বলেছেন,

'পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে,
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে
দৈবে তারে মেলে।'

---আর এ কথা শুনেননি, 'যে জিনিস ইচ্ছা ক'রে হারিয়ে দেওয়া হয়, তা কেউ খুঁজে পায় না।'

---বাঃ! আমার জীবনের বড় বাস্তব কথা বলেছ মুনী!

---জীবনের বাস্তবতাই বড় তিক্ত মৌলানা সাহেব! বেশ, তাহলে জবাব কখন জানাবেন?

---আমি রাত্রে ফোন করব।

## (১৫)

রাত্রে ফোন এল মুনীরের। সে বাদরিয়্যাকে দিতে বললে তাকে দিয়ে দিল। কথা বলতে লাগল মুনীর ঃ-

---কাইফা হালুকি ইয়া বাদরিয়্যা? (কেমন আছ, বাদরিয়্যা?)

---অল্লাহি, আল-হামদু লিল্লাহ, বিখাইর। (আলহামদু লিল্লাহ ভাল



আছি।)

---আনা উহিব্বুকি ইয়া গালিয়াহ। (আমি তোমাকে ভালবাসি, সোনামণি!)

---অআনা আইয়্যান উহিব্বুক। য়া'নী আন্তা মুওয়াফিক্ব? (আর আমিও আপনাকে ভালবাসি। তার মানে, আপনি সম্মত?)

---ইন শাআল্লাহ। তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহ।

---জাযাকাল্লাহু কুল্লা খাইর।

বলেই উল্লাসে উল্লসিত হয়ে বাদরিয়্যা লাইন কেটে দিল।

কিন্তু সামনে আছে আরো বাধা। তা উল্লংঘন করবে কী ক'রে? মুনী-র কাছে বুদ্ধি চাইল সে। মুনী বলল, 'এ তোমাদের খাস ব্যাপার। তুমিই সরাসরি কথা বল।'

---আমি পারব না। তুমিই আমার মাকে বল।

এক সময় বাদরিয়্যার মা মুনীকে বলল, 'তোমার স্বামীর খবর কী?'

---খাল্লীহি য়্যারূহ সিত্তীনা দাহিয়াহ। (অর্থাৎ, তাকে উৎসন্নে যেতে দিন।)

এখন সে যেন কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। বলল, 'বাদরিয়্যার কী বিয়ে হবে না?'

---ওকে আর কে বিয়ে করবে মা? ও তো বিকলাঙ্গ।

---কোন বিদেশীকে দিলে করবে না?

---কেউ করলে করতেও পারে। কিন্তু আমরা আমাদের বংশে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। তাছাড়া বাদরিয়্যাও হয়তো করতে চাইবে না।

---বাদরিয়্যার মন আছে। ঐ যে 'মিস্‌য়ার' নাকি বলছে, সেই বিয়ে

দিলে কেমন হয়?

কথা বলতে বলতে বাদরিয়্যার রুমে প্রবেশ করল দু'জনে। মা বলল, 'বিদেশীই বা কে করবে?'

মুনী বলল, 'সে আমি ঠিক ক'রে নেব? আপনারা রাযী হবেন কি না বলুন?'

---কাকে ঠিক ক'রে নেবে?

---ঐ যে মুত্বাওয়া। যে আমাদের বাড়ি মাঝে-মধ্যে আসে।

---ইমাম সাহেব? ও তো 'ইবনু হালাল' (ভাল লোক)।

এবারে বাদরিয়্যা বলল, 'মা! তুমি একটু আব্বাকে বল না।'

মা মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে সস্নেহে বলল, 'বিছানাগত রোগীর ছেলের মা হওয়ার সাধ হচ্ছে বুঝি?'

---কেবল একজনের স্ত্রী হতে চাই মা। চির দুর্বল হয়েও যেন আমার মনে বল আসে। চির অক্ষম হয়েও যেন আমি সক্ষমের মতো জীবন ধারণ করতে পারি। আমি যেন ভাবতে পারি যে, আমারও মাথায় মণির মুকুট আছে।

বাদরিয়্যার আব্বা বড় ভাল মানুষ। তার নিকট দেশী-বিদেশীর কোন পার্থক্য নেই। তার ভাল-মন্দ বিচার করার কষ্টিপাথর হল পরহেযগারী। সুতরাং আম্মা আর্জি রাখলে অসহায় মেয়ের আশা পূরণ করতে রাযী হয়ে গেল। এক রাতে দু'জন সাক্ষীর সামনে কাযী সাহেব সামান্য মোহরের বিনিময়ে মুনীর ও বাদরিয়্যার চির-বন্ধন কায়েম ক'রে দিলেন।

## (১৬)



মহান আল্লাহ যখন কোন মানুষের নিকট থেকে কিছু কেড়ে নেন, তখন তাকে তার বিনিময়ে অন্য কিছু দানও করেন। মহান আল্লাহ আরব-দুলালী বাদরিয়্যার নিকট থেকে চলাফেরা করার শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে দান করেছিলেন তার দেহ-যৌবনে অপরূপ সৌন্দর্য।

সকাল হতেই বিউটি পার্লারের মহিলা কর্মী ডেকে সুইটি বিউটিকে ভেরি বিউটিফুল ক'রে তোলা হল। দুপুরে মুনীরের দাওয়াত ছিল। যোহরের নামাযের পর সে বাদরিয়্যার বাসায় এলে মুনীরা তার রুম হতে বের হয়ে মুনীরকে প্রবেশাধিকার দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে অন্য রুমে চলে গেল।

সালাম-মুসাফাহাহ ও চুম্বন বিনিময়ের পর প্রেম-কালাম শুরু হল দু'জনের। মুগ্ধ-নয়নে পরস্পর তাকিয়েছিল।

বাদরিয়্যা স্বামীর প্রতি প্রেমপরবশ হয়ে বলল, 'আমি মনে মনে ভাবতাম যে, আল্লাহ আমাকে কেন এমন প্রতিবন্ধী ক'রে সৃষ্টি করলেন? তাঁর তকদীরে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমি সেই কারণ বুঝতে পেরেছি।'

---কী কারণ বুঝতে পেরেছ?

---আমি প্রতিবন্ধী না হলে আপনার মতো স্বামীর স্ত্রী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

---আমি বুঝি খুব ভাল স্বামী?

---অবশ্যই।

---স্বদেশীর তুলনায় বিদেশী আবার ভাল হয়?

---একশ' বার হয়।

---তোমার দেশের মানুষ কি স্বীকার করে এ কথা?

---অন্ধ পক্ষপাতিত্বগ্রস্ত অবিবেচক না হলে অবশ্যই করবে। আমি আব্বার কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে পেট্রোল ও খনিজ-সম্পদ বের হওয়ার আগে লোকেরা 'হিন্দ্' (ভারত) যেত। সেখানে ব্যবসা ও পরিশ্রম ক'রে অর্থ উপার্জন ক'রে আনত। আমাদের বাপ-দাদারা বলত, "আল-হিন্দু হিন্দাক, ইয়া মা ইন্দাক।" (তোমার কাছে অর্থ না থাকলে ভারত চলে যাও।) আর আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে। 'আজনবী' (বিদেশী মানুষ)কে আমরা ঘৃণা করি, অথচ আমরাও একদিন 'আজনবী' ছিলাম। মানুষকে ঘৃণা করা মোটেই উচিত নয়। আজ বিদেশীরা যদি আমাদের দেশে না আসত, তাহলে কি আমরা চলতে পারতাম?'

---তোমার আব্বা সত্যই মহানুভব মানুষ।

---বড় ন্যায়পরায়ণ ও হকপন্থী।

---আমি যদি বলি, 'আমি তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব, তাহলে যাবে তুমি?'

বাদরিয়্যা গম্ভীর হয়ে বলল, 'অবশ্যই যাব, তবে সঙ্গে মুনীকে যেতে হবে।'

মুনীর মুখ চেপে হেসে বলল, 'তাহলে ওকেও আমাকে বিয়ে করতে হবে?'

---তা কেন হবে? ওর তো স্বামী আছে। তবে বেচারা মিসকীন। আল্লাহু য়্যুসলিহু হা-লাহ।

---আমীন।

আরব্য সুন্দরী বাদরিয়্যার রূপ-যৌবনের তুফান তোলা ব্যাকুল



বসন্তের কথা অনুমান ক'রে মুনীর যা লিখেছিল, তা স্বচক্ষে দর্শন ক'রে অভিভূত হয়ে সেই সময় স্মরণ করতে লাগল,

ও আমার মন জ্বলে রে আমার প্রাণ জ্বলে রে,
যৌবন দাহনে আমার দেহ জ্বলে রে।।
আমার এ দেহ কাঞ্চন সেও তো বড় দুশমন
এ রূপের বাঁধনে অন্য কেহ জ্বলে রে।
যৌবন দাহনে আমার দেহ জ্বলে রে।।
রজনী তমসে থাকি হেমাঙ্গ রেখে ঢাকি
রাতের গগনে শশী সেহ জ্বলে রে।
যৌবন দাহনে আমার দেহ জ্বলে রে।।
সপ্ত নরক ঢালা যৌবনের অগ্নিজ্বালা
এ ফুল বদনে প্রত্যহ জ্বলে রে।
যৌবন দাহনে আমার দেহ জ্বলে রে।।
অকাম প্রেমের দেবী শীতলা এ রূপসেবী
বসন্ত কাননে যেন এহ জ্বলে রে।
যৌবন দাহনে আমার দেহ জ্বলে রে।।

প্রথম সাক্ষাতে বাদরিয়্যাই বেশী খুশী ছিল। সে জানত, মুনীর তাকে বেশী সময় দিতে পারবে না। কারণ, গোপনের এ মিলন চিরদিন গোপনই রাখতে হবে। সর্বোপরি বিবি রুম্মানা জানতে পারলে তো আর রেহাই নেই। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীতে বড় আনন্দের সাথে খাওয়া-দাওয়ার পর আসরের পূর্বেই মুনীর বিদায় নিল।

ঘন ঘন যাতায়াতে প্রতিবেশী লোকেদের সন্দেহ হতে পারে---এই আশঙ্কায় মাসে ২/ ১ বার যাতায়াত করতে লাগল।

'ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথায় পায়?' প্রতিবন্ধী বাদরিয়্যার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে মুনীর। আগ্রহ কমে যায় দানাহীন বেদানার প্রতি। অবশ্য খাওয়া-দাওয়া যেহেতু তারই কাছে, তাই তারও মন যোগাতে হয়। তাছাড়া যৌন ব্যাপারে তার কোন চাহিদাই নেই। তাই তেঁতো হয়ে সে মুনীরকে অনুমতি দিয়েছে, সে অন্য একটা বিয়ে করতে পারে। হয়তো বা সহজ নয় বলেই অনুমতি দিয়েছে। আর সেই সাথে নিজের জেদ বহাল রেখেছে।

সুতরাং মুনীর তার কাছে আচারে-ব্যবহারে তপ্ত হলেও বাদরিয়্যার কাছে ঠাণ্ডা হয়। একদিকে নরকের অনল, অন্য দিকে স্বর্গের জল। এক সময় রোদে থাকে, পরক্ষণে ছায়া পায়। কোন সময় মরুভূমিতে পড়লে, পরক্ষণে মরূদ্যান পায়। এক জায়গায় ব্যথা পেলে, অন্য জায়গায় মলম পায়। একজনের কাছে দুঃখ পেলে, অপর জনের কাছে সান্ত্বনা ও সুখ পায়। একজনে কাঁদায়, অপর জনে হাসায়।

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। রুম্মানা স্বদেশ তথা আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছট্‌ফট্ করতে থাকে। আর মুনীরের বিদেশে থেকে মন-জান ভরে। পরবাসের বনবাস, কদু ও মধুর মতই; যার ভাগ্যে যা পড়ে। তবে প্রতিবন্ধী বাদরিয়্যার জন্য মুনীর অন্য কিছু। সে যেন বলে,

'কোন্ খসে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজ
সুরের অশ্রুধারা।'

## (১৭)

'চিরদিন কাহারো সমান না যায়, চিরসুখ এ ভবেতে কাহারো না



রয়।' মুনীরেরও রইল না। একদিন সকালে সে বাথরুমে ছিল। স্ত্রী ছিল ঘুমিয়ে। তারই পাশে মোবাইলটা বারবার রিং হচ্ছিল, আর কেটে যাচ্ছিল। চতুর্থবারে রুম্মানা ঘুমের ঘোরে তুলে রিসিভ ক'রে কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলার আগেই মুনী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, 'মওলানা সাহেব! আপনি ঘুমিয়ে থাকুন, মোবাইল তুলছেন না। আর এদিকে আপনার বেগম সাহেবার অবস্থা খারাপ। একবার দেখা ক'রে যান। রাত থেকে বমি-পায়খানা থামে না।'

এক শ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে রুম্মানার কথা মনে হতেই বলল, 'হ্যালো! হ্যালো!'

আর কোন শব্দ নেই। অপর দিক থেকে মহিলা কণ্ঠে 'বেগম সাহেবা'র খবর শুনে রুম্মানা মোবাইল বন্ধ ক'রে উঠে বসল। সন্দেহের পীড়নে তার রাতের মাথাব্যথা আরো জোরদার হয়ে উঠল। মুনীর বাথরুম থেকে এসেই দেখল, তার মোবাইল হাতে রুম্মানা বসে আছে। মুনীর জিজ্ঞাসা করল, 'কার ফোন ছিল?'

রুম্মানা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার বেগম সাহেবার।'

মুনীরের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল। ভাবল, সত্যই কি বাদরিয়্যা তাকে এই সময়ে ফোন করেছিল? এত বোকামি তো সে করবে না। মোবাইলটা নিয়ে রিসিভ্ড কল ওপেন করতে করতে বলল, 'বেগম সাহেবা আবার কে?'

---সে তো তুমিই বলতে পারবে। এটা তো আমার জিজ্ঞাস্য।

মুনীর দেখল, সে নম্বর মুনী-র। তারপর সে হাসতে হাসতে বলল, 'এ তো সেই মুনী, যার কথা তোমাকে বলেছি। ও আমাদেরই দেশের মেয়ে, এক বাড়িতে কাজ করতে এসেছে।'

---আর খোঁজ পেয়ে তুমি তাকে 'বেগম' বানিয়ে ফেলেছ।

পরিস্থিতির সামাল দিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল মুনীর। তবুও রুম্মানা মুনীকেই 'বেগম সাহেবা' বলে ধারণা করেছে। তাও খানিক রক্ষে। মুনীর তার পাশে গা ঘেঁসে বসে বলল, 'দেখ রুম্মানা! আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এদেশে বিয়ে ততটা সহজ নয়, যতটা তুমি ভাবছ এবং যতটা আমাদের দেশে সহজ। এখানে কোন মুসলিম প্রবাসী নারীকে বিবাহ করতে তার অভিভাবকের এবং কাফীলের সম্মতিপত্র লাগে। অবশ্য নও মুসলিম মহিলা হলে সহজ। কাজী সাহেবের ওকালতিতে বিয়ে হয়ে যায়। আর তুমি তো জান, মুনী একজন মুসলিম নারী। তাছাড়া সে একটা ঘরের ঝি। আর ঘরের ঝি-কে কারো "বেগম সাহেবা" হতে দিলে, কাফীলের কাজ করবে কে?'

---তাহলে ও নিজ মুখে সে কথা বলল কেন?

মুনীর গায়ে হাত দিয়ে তাকে পটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু রাগমূর্তি রুম্মানা ঘুরে বসে বলল, 'আমার গায়ে হাত দেবে না। আমি তোমার কেউ নই। আজ বুঝতে পারলাম, তুমি কেন আমাকে মেজাজ দেখাও, নানা কথা শোনাও।'

---ভুল করলে তো কথা শুনতেই হয়। আমি ভুল করলে আমিও অফিসের মুদীরের কাছে কত কথা শুনি।

---আমি কোন ভুল করি না। কিন্তু তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। তুমি আমাকে তালাক দাও। আমি আর তোমার ভাত খেতে চাই না। তুমি আলেম নও, তুমি জালেম, ধোঁকাবাজ, প্রতারক! আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও, আজই, এক্ষুনি। আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকতে চাই না।'



উঁচু গলায় বলতে বলতে কেঁদে ফেলল রুম্মানা। মুনীর ঠাণ্ডা মাথায় বুঝাবার কত চেষ্টা করল, কিন্তু কোন লাভ হল না।

বাসা ছেড়ে মুনীর বাইরে আসতে গেলে দরজা আটকে বসল রুম্মানা। বলল, 'তুমি যদি আমাকে দেশে না পাঠাও, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। তুমি কথা দিয়ে বাইরে যাও।'

অতঃপর বাথরুমে এসে ক্লোরোক্সের ডিব্বার ঢাকনা খুলে মুখের উপর তুলে খেতে গেল। ছুটে গিয়ে মুনীর সরিয়ে দিলে তার গায়ে ঢালা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার রঙিন ম্যাক্সির রঙ বিগড়ে গেল।

বাধ্য হয়ে মুনীর বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যদি তাই বল, তাহলে আমি তোমার সফরের ব্যবস্থা করছি।'

অতঃপর তার বাপের বাড়িতে টেলিফোন ক'রে পরামর্শ চাইল। শ্বশুর মশায় বললেন, 'মেয়েরা সতীনের নামও শুনতে চায় না বাবা! যদি আত্মহনন করতে যায়, তাহলে তো ভয়ের কথাই বটে। তুমি একবার ওকে নিয়ে বেড়াতে এস, আমরা এখানে বুঝিয়ে দেখব।'

---টিকিটের খরচ তো আছে। রুম্মানার একদিকের টিকিট কাটব, নাকি রিটার্ন টিকিট?

---রিটার্ন টিকিট কেটেই এস, তারপর দেখা যাবে।

মুনীর সত্বর সফরের ব্যবস্থা করতে লাগল। সারাদিন আর খাওয়া হল না। রুম্মানা তো খেলই না। সে মুনী-র সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে আসল ঘটনা বুঝতে পেরে বাদরিয়্যাকে দেখা করতে গিয়ে তার কাছে 'জারীশ' (গোটা গমের প্রস্তুতকৃত খাবার) খেল। ঘটনা খুলে বললে তারাও ভীষণভাবে মর্মাহত হল। বড় লজ্জিত ও ভর্ৎসিত হল মুনী।

ভিসা লাগতে ও প্লেনের সিট পেতে দু'দিন কেটে গেল। তারপর

রুম্মানার এগারো মাসের ভিসা লাগিয়ে একদিন স্বামী-স্ত্রীতে পৌঁছে গেল নিজ নিজ বাড়িতে।

রুম্মানার মন আসলেই মুনীরের প্রতি বিষিয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ বিয়ের পর থেকেই তাকে খুব একটা পছন্দ ছিল না। তার পছন্দ ছিল তার ভাই-দোলা-ভাইদের মতো এমন একজন সাথীর, যে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব চায় না। সুতরাং বুঝ মানার কোন প্রশ্নই আসে না। আব্বাকে বলে তালাক নিতে তাকীদ করল সে। তালাক না নিলে এখানেও আত্মহত্যা করার ভয় দেখাল। কিন্তু সেটাকে কেবল হুমকি মনে ক'রে শ্বশুর মশায় মুনীরকে সঊদিয়ায় ফিরে যেতে আদেশ করলেন এবং বললেন, 'পারলে সে রুম্মানাকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত ক'রে রাখবে। পরে এক সময় এসে আবার তাকে নিয়ে যাবে।'

কিন্তু মেয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে, 'আব্বা যদি ঘরে না রাখে, তাহলে সে ভাইদের বাড়িতে ঝি-গিরি ক'রে খাবে, তবুও সঊদিয়ায় আর সে ফিরবে না।'

মুনীর যদিও অন্তর থেকে তাকে চাইত না, তবুও সমাজের খাতিরে রুম্মানাকে টেলিফোন করে। কিন্তু সে তার ফোন রিসিভ করে না, তার সাথে কথাই বলতে চায় না।

দেখতে দেখতে ছয় মাস কেটে গেল। একদিন মুনীর রেজিষ্ট্রি চিঠি পেল। তাতে ছিল রুম্মানার পক্ষ থেকে খোলা তালাকের কাগজ। মুনীর 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়ল এবং বাসর রাতে যে মুনাজাত করেছিল, তা মনে করতে লাগল,

"হে আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবারে বর্কত ও প্রাচুর্য দান কর এবং ওদের জন্যও আমার মাঝে বর্কত ও মঙ্গল দান কর। হে আল্লাহ!



যতদিন আমাদেরকে একত্রিত রাখবে ততদিন মঙ্গলের উপর আমাদেরকে অবিছিন্ন রেখো এবং বিছিন্ন করলে মঙ্গলের জন্যই আমাদেরকে বিছিন্ন করো।"

## (১৮)

মুনীর এখন বাসায় একা। নিজের হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হয়। সে বড় কষ্টের কাজ। এতদিনে সে বুঝেছে, বউ না থাকার কত কষ্ট। এত দিনে সে বুঝেছে, 'গুরু-নিন্দা অধোগতি, জরু-নিন্দা শুধু ভাতি' প্রবাদের মানে।

কোনদিন তার ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয় না। যেদিন কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে খেয়ে আসে, সেদিন তো ভালই যায়। আর বেশির ভাগ সে তাই করে। অবশ্য বাদরিয়্যাও তাদের বাড়িতে খেতে বলে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তবে যখন যায়, তখন আগামী বেলার খাবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। আর তা না হলে দোকান থেকে দই-রুটি নিয়ে এসে খেয়ে কাজ চালায়।

রুম্মানার তালাকে বাদরিয়্যা ও মুনী উভয়েই খুশী। বিশেষ ক'রে মুনী ও মুনীরের মাঝে বিবাহের পথ যেন খোলা গেল। সে দেশে গেলেই খোলা তালাক নিয়ে নেবে। দেশে যেতে আর ছ'মাস বাকী।

ওদিকে তালাকের খবর পেয়ে নূরীও খুব খুশী। কিন্তু মুনীর সাথীহারা বলে তার মনে খুব কষ্ট হতে লাগল। তবে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে তার কথাবার্তায় পরিবর্তন এল। আগে কথা বলত ভাই-বোনের মতো, কিন্তু এখন বলে সেই আগের মতো। বোনের মধ্যে আবার বান আসার আলামত লক্ষ্য করা গেল। মুনীরের নূর আবার মুনী ও নূরীর সমুদ্রে

জোয়ার আনতে লাগল। অবশ্য নূরীর মনে এ কথা নেই যে, সে আফতাবকে বর্জন ক'রে মুনীরকে গ্রহণ করবে।

কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা অন্য রকম। একদিন গভীর রাতে থানা থেকে ফোন এল, 'শায়খ মুনীর! জলদি আসুন, তর্জমা করতে হবে।'

সেখানে গেলে পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। দেখল, দু'জন লোক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেডে শুয়ে আছে। একজন মিসরী এবং অপরজন হিন্দী। দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য কথা বলতে হবে তাদেরকে। মিসরী পড়ে আছে জ্ঞানশূন্য অবস্থায়। আর হিন্দী দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করছে।

---আপনার নাম কী?

'আ-ফতা-ব' বলার চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছু বলতে পারল না।

আচমকা থমকে গিয়ে তার 'ইক্বামাহ' (প্রবাসে বাস করার অনুমতি-পত্র) দেখতে চাইল। সে অবশ্য নূরীর স্বামী আফতাব আলমের কথা শুনেছে। তার সাথে ফোনে কথাও বলেছে। তবে তাকে চোখে দেখেনি। কিন্তু ভিতরের পাতায় নূরীর চেনা ছবি দেখে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল।

কথা বলতে না পারায় দুর্ঘটনার বিশেষ কিছু জানা গেল না। পুলিশ তাকে পরদিন সকাল দশটায় একবার আসতে অনুরোধ করল। অতঃপর শোক-সন্তপ্ত মনে সে বাসায় ফিরল।

সর্বপ্রথম সে ফোন করল নূরীকে। মোবাইল তার ওপেনই ছিল। স্বামী বাসায় নেই বলে সে জেগেই ছিল। রিসিভ ক'রে 'হ্যালো' বলতেই নূরী আগেভাগে সালাম দিল। সালামের উত্তর পেয়ে সে বলল, 'এত রাত্রে? রুম্মানা নেই বলে ঘুম আসছে না বুঝি?'

---তাই বটে। তোমার সাথী নেই বুঝি, তাই তুমিও জেগে আছ।



---হ্যাঁ, ও আল-ক্বাসীম নাকি বলল, সেখানে কোম্পানির কোন জরুরী কাজে গেছে। মধ্য রাত্রেই ফেরার কথা ছিল, এখনো ফিরল না বলে দুশ্চিন্তায় ভুগছি।

এ দুর্ঘটনার খবর কী ক'রে তাকে বলবে এবং তারপর তার প্রতিক্রিয়া কী হবে---তাই ভাবতে ভাবতে মুনীর জিজ্ঞাসা করল, 'আফতাব ভায়ের কোন আত্মীয় আছে নাকি রিয়াযে?'

---না কেউ নেই।

---আর তোমাদের?

---আমাদেরও কেউ নেই আপনি ছাড়া। কেন কী ব্যাপার?

---না, এমনি কথাটা মাথায় এল, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

---আমি রুম্মানার মত আত্মীয়-স্বজনের জন্য মাথা খারাপ করি না। আমার স্বামী সুখে বনবাসে কোন সমস্যা নেই জী!

মুনীর ভাবল, তাকে এত রাত্রে বিপদের খবর শুনিয়ে কোন লাভ হবে না। ইন্ডিয়াতেও ফোন ক'রে রাত জাগিয়ে কোন লাভ নেই। সুতরাং সে নূরীকে বলল, 'এখন রাখছি, সকালে কথা বলব। কাল আমি তোমাদের বাসায় যেতে পারি।'

---সত্যিই? এর চেয়ে বড় আনন্দের খবর অন্য কিছু শুনিনি। তাহলে আমি এখন ঘুমিয়ে যাই।

ভোর হতে হতে মুনীর একটি গাড়ি ভাড়া ক'রে বেরিয়ে গেল রিয়াযের দিকে। একজন বেগানা মহিলাকে সঙ্গে ক'রে আনা নিষিদ্ধ শরীয়তে এবং এ দেশেও। তবুও তার ইক্বামায় যেহেতু রুম্মানার নাম ও ছবি আছে, তাই সমস্যা ভাবল না সে। গাড়িতে যেতে যেতে নূরীর আব্বাকে ফোন করল এবং দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে দিল। আর সেই সাথে নূরীকে

সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়ার মতো কিছু বলতে অনুরোধ করল।

প্রায় আড়াই-তিন ঘন্টার পর রিয়াযে আফতাবের ঠিকানায় যখন সে পৌঁছল, তখন নূরী খবর পেয়ে কাঁদছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে, ওস্তাদ মুনীর সকালে কেন আসছেন?

বাসার দরজা খুলতে নূরী আরও উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগল। মুনীর আল্লাহর ভরসা দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে এবং সুস্থ হয়ে উঠবে এই আশা দিয়ে তাকে তার সঙ্গে যেতে বলল। নূরী বোরকা পরে বাসার লাইট ইত্যাদি বন্ধ ক'রে দিয়ে চাবি নিয়ে তালাবদ্ধ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

রিয়ায থেকে বের হয়ে এক পেট্রোল-পাম্পে তেল ভরার জন্য ড্রাইভার গাড়ি থামাল। সেই সুযোগে মুনীর কেক, জুস, পানি ইত্যাদি নিয়ে নিল নাশ্‌তার জন্য। কিন্তু শত অনুরোধ সত্ত্বেও নূরী কিছু খেল না। যেহেতু দুশ্চিন্তা তার খাওয়ার রুচিও কেড়ে নিয়েছিল।

স্বালবূখ চেকপোস্টে চেকের জন্য গাড়ি যাওয়ার সময় থামায়নি, ফেরার পথে থামাল। ইক্বামাহ চেক ক'রে পুলিশটি মুনীরকে বলল, 'এ কি তোমার স্ত্রী?'

---লিখাই তো আছে।

---তুমি মুসলিম, আর তোমার স্ত্রী কাফের কেন?

--- তা কেন হবে?

---এই তো ওর কপালে টিপ রয়েছে।

কে জানে ঐ পুলিশকে কে বলেছে যে, ভারতের কেবল অমুসলিম মহিলারাই টিপ পরে। অথবা অভিজ্ঞতায় সে জানতে পেরেছে। অথচ তার সে অভিজ্ঞতা নিছক ভুল।

ভাগ্যে নূরীর চেহারা খুলে ছবি মিলায়নি। নচেৎ বিপদের উপর বিপদ



হত অবশ্যই। সাধারণতঃ এত কড়াকড়ি হয় না। তবুও অনেক সময় 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।'

আল-গাত্ব শহরের বিশাল উঁচু পাহাড় থেকে গাড়ি নামছে, আর সেই সময় বুরাইদার পুলিশের ফোন এল, 'কোথায় আপনি?'

---এক ঘন্টার মধ্যে আসছি।

কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছলেই বা কী হবে? রোগীর অবনতি বৈ উন্নতি হয়নি। তার মাথায় চোট লেগেছে। তখন রোগীকে দেওয়া হয়েছে 'ইনায়াহ মুরাক্কাযাহ' (I.C.U.)তে। শ্বাসকষ্ট হওয়ার জন্য নাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। আওয়াজ দিলে চোখ মেলে তাকাচ্ছে।

কাছে যাওয়ার আগে নূরীকে বলে দেওয়া হল, তুমি আওয়াজ ক'রে কাঁদবে না।

কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলে আফতাব চোখ মেলে তাকাল। বোরকার নেকাব তুলে নূরী মুখের উপর ঝুঁকে কাঁদতে লাগল। আফতাবের মুখে কোন শব্দ ছিল না। তার চোখ দু'টি থেকে অশ্রুধারা বিগলিত হতে লাগল। সে নিশ্চয় অবাক হয়েছিল যে, নূরী কীভাবে এখানে এল?

নূরী পরিচয় দিয়ে বলতে লাগল, 'ইনি আমার সেই ওস্তাদজী মওলানা মুনীরুয যামান সাহেব। উনার সাথেই আমি এলাম।'

আফতাব নামে চিনত মুনীরকে। মহাবিপদে তাকে কাছে পেয়ে তার মুখমণ্ডলটা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। নিশ্চয় তার দেহের ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল। নূরীর একটি হাত ধরে টেনে মুনীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে যেন বলতে চাইল, 'আপনার হিফাযতে থাকল। একে আপনি দেখবেন।'

মুনীর সাহস দিয়ে বলল, 'আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

আফতাব হাত দু'টিকে উপর দিকে তোলার চেষ্টা ক'রে যেন আল্লাহর নিকট দুআ করতে আবেদন জানাল।

সকালে হাসপাতালের রোগীদের সাথে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয় না। তবুও এমার্জেন্সি বলে প্রবেশ করা হয়েছিল। এবার দারোয়ান তাদেরকে বের হয়ে যেতে অনুরোধ করল। 'আবার বিকালে আসব' বলে তারা আফতাবের নিকট থেকে বিদায় নিল।

হাসপাতালের গেটের কাছে এক পরিচিত বাঙালীর সাথে মুনীরের দেখা। সে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসার পর বলল, 'শুনেছিলাম, আপনার ফ্যামেলী নাকি দেশে চলে গেছে। আবার আনলেন নাকি?'

মুনীর অত কৈফিয়ত না দিয়ে সংক্ষেপে বলল, 'হ্যাঁ, আজই আনলাম।'

নূরী মুনীরের সাথে পথ চলতে ইতস্ততঃ বোধ করেনি; যদিও লোকে তাকে তারই স্ত্রী ভাবছে। যেহেতু সে একান্ত অন্তরের মানুষ। তাছাড়া তার সাথে চলা বিনা উপায়ও তো নেই। সে ভাবছিল, হয়তো তাকে তারই বাসায় থাকতেও হবে। তাতেও তার কোন সংকোচ ও বাধা ছিল না। যেহেতু সে তাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুনীর তা বৈধ ও সমীচীন মনে না ক'রে ফোন করল মুনীকে। মুনী ঘটনা শুনে মর্মাহত হল। সে বাদরিয়্যার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রিটার্ন ফোন করল মুনীরকে।

---এখানেই দিয়ে যান নূরীকে। কোন অসুবিধা হবে না। এটাই বুঝি সেই ইচ্ছা ক'রে হারিয়ে দেওয়া জিনিস। আল্লাহ হয়তো আপনাকে আপনার জিনিস ফিরিয়ে দেবেন।

---এখন মজাক রাখ। ওকে সঙ্গে রেখে সান্ত্বনা দিয়ো। আর কিছু



বুঝতে দিয়ো না।

---ঠিক আছে।

মুনী ও বাদরিয়্যার ব্যবহারে নূরী মুগ্ধ ও অবাক হল। সে বিদেশে অপরিচিত জায়গায় এমন সমাদর পাবে, তা কল্পনাই করতে পারেনি। ভাবল, ওস্তাদজীর সাথে এদের খুব যোগাযোগ আছে।

বাদরিয়্যা বুঝায়, মুনী অনুবাদ ক'রে শোনায়। মুনী নিজেও বুঝায় ও সান্ত্বনা দেয়। টিসু নিয়ে নিজে তার চোখের পানি মুছে দেয়।

আশঙ্কার সাথে কাঁদতে কাঁদতে নূরী বলে, 'মাথায় আঘাত লেগেছে। মাথার ভিতরে রক্ত জমে আছে, অপারেশন ক'রে বের করতে হবে। বলছে, বড় রিস্‌ক আছে। হয়তো বাঁচবে না। আর বাঁচলেও হয়তো স্মৃতি, শ্রবণ অথবা দর্শনশক্তির মধ্যে কোন একটা হারাবে। এ আমার কী কপাল হল? আমার কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল।'

মুনী তার মাথার কেশে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'কেঁদো না নূরী, ধৈর্য ধর। তকদীরের উপরে কি মানুষের হাত আছে বল? আল্লাহর কাছে দুআ কর, যেন ভাগ্য ভালই হয়। তুমি তো ভাল ভাগ্য নিয়েই জন্ম নিয়েছ নূরী। এক স্বামী চলে গেলে, দ্বিতীয় ভাল স্বামী পাবে। আর আমার কথা ভেবে দেখ, আমার স্বামী থাকতে না থাকা। আবার চলে গেলেও মনে হয়, দ্বিতীয় স্বামী হয়তো তার থেকেও খারাপ হবে। 'যখন বিধি মাপায়, তখন উপরি উপরি চাপায়। আর যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্বা বনে বাঘ ঝাঁকে।'

মুনী-র কথায় বিপদের মাঝে খুশীর সংবাদ রয়েছে। মেঘের আড়ালে সূর্যালোকের ঝিলিক রয়েছে। কিন্তু বিপদ তো বিপদই। মুনীরকে হারিয়ে পুনঃ ফিরে পেতে সে তো আফতাবের মৃত্যু কামনা করতে পারে না।

নূরীর আব্বা-আম্মা ও শ্বশুর-শাশুড়ী বারবার টেলিফোন ক'রে তাদের খবর নেয়। কিন্তু খবর আশাব্যঞ্জক বলে তো মনে হয় না। নূরীর আব্বা-আম্মার মনে হয়তো বল আছে, জামাই গেলে, জামাই ফিরে পাবে। কিন্তু আফতাবের আব্বা-আম্মার ছেলে চলে গেলে, আর ছেলে ফিরে পাবে না। বিধির বিধান উল্লংঘন করার ক্ষমতাও তো নেই কারো।

বিকালে রোগী সাক্ষাতের সময় হলে বাদরিয়্যা মুনীকে নূরীর সাথে যেতে আদেশ করল। মুনীরের গাড়িতে উভয়ে হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছে দেখল, আফতাব আর তাকিয়েও দেখতে পারছে না। বিভিন্ন যন্ত্র লাগানো হয়েছে তার দেহে। মুখটা ফুলে উঠেছে। দেখেই ভয় লাগছে। নূরী কেঁদে উঠল। সশব্দে কাঁদতে নিষেধ ক'রে মুনীর তাকে ধৈর্য ধরতে আদেশ করল।

দায়িত্বশীল নার্স এসে একটা কাগজ বাড়িয়ে মুনীরকে বলল, 'অপারেশনের জন্য এখানে সাইন করুন। আর এই ওষুধটা বাইরের ফার্মেসি থেকে কিনে আনুন।'

দায়িত্বশীল ডাক্তারকে আফতাবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, 'সবই আল্লাহর হাত। তাঁর ইচ্ছা হলে সুস্থ হয়ে উঠবে। চব্বিশ ঘন্টা পার না হলে কিছু বলা যাবে না। ব্রেনে আঘাত লেগেছে তো।'

নূরীর মনে আশার যে ক্ষীণ আলোটুকু ছিল, তাও ধীরে ধীরে নিভে যেতে লাগল। ওষুধটা কিনে দিয়ে তারা বাসায় ফিরে গেল। হতাশার অন্ধকারে মুনীরা নূরীকে মুনীরের নূর দেখাতে আরম্ভ করল।

এ যেন গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। মাছ রইল হাটে, বিবি মসলা বাঁটে। কেউ মরতে যাচ্ছে, আর কেউ নিজের মীরাসের অংক কষছে!



নূরী বলল, 'মুনী! তুমি কিন্তু আমার স্বামী বেঁচে থাকতেই আমাকে বিধবা বানাতে চাচ্ছ।

---তুমি কি নিরাশ হওনি বল? তোমার মনে কি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নেই? বউ মরতে বসলে পুরুষ কি শালীকে বিয়ে করার পরিকল্পনা আগে থেকেই করে না?

বিপদ যাই হোক, মুনী ও বাদরিয়্যার মত বন্ধু পেয়ে নূরী বড় ধন্য হল। এ মহাবিপদের মুহূর্তেও নূরী যেন তাদের কাছে খুশীর নূর-মহলে বাস করছিল। আচমকা মৃত্যু-সংবাদে তার মনটা যাতে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়, তারই প্রস্তুতি ও ট্রেনিং চলছিল সেখানে।

অপারেশন হল, কিন্তু আফতাবের জ্ঞান ফিরল না। রক্তের দরকার পড়ল, কিন্তু গ্রুপ মিলল না। গ্রুপ বদল ক'রে রক্ত দিল মুনীর। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হল না।

## (১৯)

নূরী মুনী ও বাদরিয়্যার সাথে বেশ সান্ত্বনার মাঝেই আছে। ইতিমধ্যে নূরী মুনী ও মুনীরের সাথে রিয়ায গিয়ে তার প্রয়োজনীয় পোশাক ও জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। তাদের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মুনীরের কথা আলোচনা হচ্ছে। পঞ্চমুখে প্রশংসা হচ্ছে মুনীরের।

একদা হাসতে হাসতে মুনী বাদরিয়্যাকে বলল, 'জান বাদরিয়্যা! নূরী না আমাদের মুনীর মুত্বাওয়ার ছাত্রী?

---তাই নাকি? তুমি ওর কাছে কী পড়তে গো?

---বাংলা আর কুরআন।

---অন্য কিছু পড়নি তো? গায়ে পড়নি তো?

---ধ্যাট! অসভ্য মেয়ে। আমি তখন ছোট তো।

---ছোট, না বর্ণচোরা আম? আচ্ছা বল তো, তুমি ওকে ভালবাসতে কি না?

সলজ্জায় নূরী মুখ নামিয়ে বলল, 'বাসতাম।'

---তাহলে ওকে বিয়ে করলে না কেন?

---সব ভালবাসা কি বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে? মানুষ এক ভাবে, তার ভাগ্যে অন্য কিছু থাকে। পালতোলা জাহাজ একদিকে যেতে চায়, হাওয়া তার বিপরীত দিকে চলে। জীবনের সব চাওয়া কি পাওয়া যায়? মনের সব আশা কি পূর্ণ হয়?

মুনী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। তবে এ পর্যন্ত বাদরিয়্যার হাওয়াই ঠিকমতো চলছে।

বাদরিয়্যাকে আরবীতে বুঝিয়ে বললে, সে হাসল। সে কোন এমন কিছু বলতে মানা করল, যাতে তার ও মুনীরের সম্পর্কের কথা ফাঁস হয়ে যায়। তারপর সে বলল, 'আমার এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে বল? এই যে চব্বিশ ঘন্টা আমি বিছানা অথবা হুইল-চেয়ারে পড়ে আছি। নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট বলেই আমি সুখে আছি।

---ঠিকই বলেছ।

নূরী যেন আজব আজব শিক্ষা শিখছে। আজব আজব অভিজ্ঞতা লাভ করছে। সে বুঝতে পারল, মাদ্রাসার দ্বীনী লাইন ও স্কুল-কলেজের দুনিয়াবী লাইনের শিক্ষার মধ্যে কত পার্থক্য!

এক রাত্রে এক বিছানায় গল্প করতে করতে হঠাৎ নূরী মুনীকে বলল, 'আমার ওস্তাদকে তোমার মতো একজন মেয়ের দরকার ছিল। কিন্তু হতভাগী রুম্মানার পাল্লায় পড়ে তাঁর জীবনটা বেকার হয়ে



গেল।'

মুনী নূরীর গালে হাত রেখে বলল, 'আর তুমি হতচ্ছাড়ী বুঝি তাঁর জীবনকে বেকার করনি? তুমি বুঝি তাঁকে ধোঁকা দাওনি? কেন বিয়ে করলে তুমি তাঁকে ছেড়ে অন্যকে?'

---মেয়েদের কী কোন এখতিয়ার চলে মুনী? তুমি কি নিজের এখতিয়ারে বর পছন্দ করেছিলে? মা-বাবার সামনে কি জোর চলে? অবশ্য যারা মান-সম্মানের পরোয়া করে না, তারা প্রেমিকের হাত ধরে বেরিয়ে যায়। আর আমার কি সেই উপায় ছিল? আমি তো উনার ঠিকানাও জানতাম না। এই এলাকার কোন সাহারায় সে আমার জন্য কেঁদে কেঁদে মেষ চরিয়েছে। তাহলে আমি কী করতাম বল? একটা কাজ আমি করতে পারতাম, বিষ খেয়ে অথবা গলায় দড়ি নিয়ে আত্মহনন করতে পারতাম। কিন্তু তাতে কার কী লাভ হত বল?

এই বলে নূরী কাঁদতে লাগল। হঠাৎ মুনীরের ফোন এল, 'নূরী কেমন আছে?'

---কাঁদছে তো। ওকে আপনি নিয়ে গিয়ে আপনার কাছে রাখুন। আপনার জিনিস আপনি সামলে নিন। আমরা এ দামাল শিশুকে সামালতে পারছি না। বড় হামলাচ্ছে, বড়......।

'ধুৎ' বলে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে নূরী বলল, 'জী! আস্-সালামু আলাইকুম। ও সব মিথ্যা কথা বলছে জী। বড় ফক্কড় মেয়ে ও।

---আমি জানি। কিন্তু বড় ভাল মেয়ে বল।

---চরম ভাল। একেবারে আমার মনের মতো। আপনাকেও নিশ্চয় ভাল লাগে?

---একটা হাদীস আছে নূরী! যার অর্থ হল, "আত্মাসমূহ সমবেত

সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।"

---পরিচিত হয়ে মিলন কি দূরে থেকেই হয়? নাকি কাছে থেকেও হয়?

---সেটা তো ভাগ্যের ব্যাপার নূরী।

---ও কেমন আছে?

---কোন পরিবর্তন নেই। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাক।

দেখতে দেখতে এবং প্রত্যহ দেখা ক'রে আসতে আসতে পঁচিশ দিন পার হয়ে গেল, আফতাবের জ্ঞান আর ফিরল না। ইতিমধ্যে তার মিসরী সাথী মারা গেছে, তার জানাযাও হয়ে গেছে। নূরীও হয়তো তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণার অপেক্ষা করছে। কারণ, তার শরীর এমনভাবে ফুলে উঠেছে যে, বাঁচবার যেন কোন আশা নেই। ইতিমধ্যে তার মনও শক্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যু-সংবাদ শোনার জন্য সে নিজের মনকে পূর্ব হতেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছে।

মন যা বলছিল, হলও তাই। একদিন নূরীকে মুনী-র সাথে বসে থেকেই সেই সংবাদ শুনতে হল। 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন।' নূরী কেঁদে কেঁদে ভেঙ্গে পড়ল। ভারত থেকে ফোন এসে বারবার তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হল। বাদরিয়্যা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দুআ শিখিয়ে দিল---

'আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী মুসীবাতী অখলুফলী খাইরাম মিনহা।'

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সওয়াব দান কর এবং



এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর।)

প্রশ্ন হল, 'লাশ দাফন হবে কোথায়?'

আফতাবের আব্বা-আম্মা বলল, 'লাশ এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমরা এখানে দাফন করব।'

নূরী বলল, 'আপনার ছেলে বলতেন, "আমি নবীর দেশে মাটি নিতে চাই।" অতএব এখানেই দাফন ক'রে দেওয়া উচিত।'

সেখানকার তবলীগভক্ত আলেমরাও নবীর দেশকে ভালবাসেন। সুতরাং তাঁরাও সেখান থেকে এখানেই আফতাবের লাশ দাফন ক'রে দেওয়ায় সম্মতি জানান।

এ ব্যাপারে লিখিত অনুমতি ও অথোরিটি আসে মুনীরুয যামানের নামে।

যথাসময়ে লাশের গোসল ও কাফন দেওয়া হয় সাধারণী জানাযা-গৃহে। তারপর রাজেহী জামে মসজিদে তার জানাযার নামায হয় জুমআর পরে। আর তার পরেই পৃথিবী ও নূরীর আকাশ থেকে চিরদিনকার মত বিদায় নেয় যুবক আফতাব। লুকিয়ে যায় বুরাইদার কবরস্থানে।

## (২০)

কিন্তু নূরী কোথায় লুকাবে? তাকে তো চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হবে। আর তার মধ্যে সে নিজের নিরাপদ জায়গা ছেড়ে বের হতে পারবে না। কোন সৌন্দর্য ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। ইত্যাদি।

তার শ্বশুর-শাশুড়ী বউ-মাকে ফিরে পেতে চায়। তারা তাদের ছোট

ছেলের সাথে তার পুনর্বিবাহ দেবে।

নূরীর আব্বা-আম্মাও মেয়েকে নিজেদের কাছে পেতে চায়, যাতে এমন মহাবিপদে তারা মেয়ের পাশে থাকতে পারে।

কিন্তু নূরী বলে, 'আমি খুব ভাল আছি মা! আমার জন্য তোমরা কোন চিন্তা করো না।'

মায়ের ভয় হয়, মেয়ে হয়তো তার অন্তরে চেপে রাখা মুনীরের প্রেমবৃক্ষকে আবার সতেজ ও বৃদ্ধিশীল ক'রে তুলছে। তা মন্দ নয়, তবে বদনাম আছে। তাই তার আব্বাও তাকে বোম্বাই ফিরতে তাকীদ করে। মুনীরকেও বলে, 'বাবা! যেভাবে হোক ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও।'

মুনীর নূরীকে বুঝায়। কিন্তু নূরী বলে, 'আমার ভয় হয় জনাবজী, আবার হয়তো আপনাকে পেয়েও হারিয়ে দেব। মা-বাপের ভুলে আমি একবার হারিয়েছি, দ্বিতীয়বার আর হারাতে চাই না।'

---কিন্তু এতে যে লোকে আমাদেরকে সন্দেহ করবে।

---কেউ করলে করতে পারে। তাতে আমাদের কী যায়-আসে?

---না-না। তুমি বরং দেশে ফিরে যাও। আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।

---ওরা নাকি আমার দেওর মাহতাবের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলেছে।

---তাতে কী হয়েছে। এবার আমি নিজে তোমার আব্বা-আম্মাকে রাযী করাব। আর তোমার মা তো আগে থেকেই রাযী ছিল।

এই মেয়ে আর সেই মেয়ে? এই মেয়ে নূরী বিদেশ ছেড়ে যেতে চায় না। আর সেই মেয়ে রুম্মানা বিদেশ ছেড়ে স্বদেশ যাওয়ার জন্য



তালাকও মঞ্জুর ক'রে নিল। মনে-মনে কত প্রভেদ!

মুনীর নূরীর আব্বাকে বুঝাল, 'নূরী খুব ভাল জায়গায় আছে। ওর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে ওকে প্লেনে চাপিয়ে দিয়ে আসব।'

নূরী ভাল জায়গায় আছে, তা তারা মেয়ের নিকট থেকেই জানতে পেরেছে। তাদের আসলে নিরাপত্তার ভয় নেই, ভয় কলঙ্কের।

ইতিমধ্যে সে ফোনে বলে দিয়েছে, 'তার যেন কোথাও বিয়ের কথাবার্তা না হয়। কারণ এবার তাকে বিয়ে করতে হলে, সে মুনীরকেই করবে।'

চার মাস দশদিন গত হয়ে গেল। একদিন মুনী ও মুনীর তাকে রিয়ায এয়ারপোর্টে প্লেন চাপিয়ে দিয়ে এল। নূরী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশে ফিরে গেল। বাদরিয়্যা ও মুনী তাকে বলেছিল, 'আবার আসবে কিন্তু পলাতকা। এবারে আসবে নব শৃঙ্খল-বন্ধনে; যে বন্ধন টুটবে না ইহ-পরকালে।'

কিছুদিন পর মুনীর কোম্পানীর পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে আফতাবের ওয়ারেসীনদের প্রাপ্য প্রায় এক লক্ষ টাকা তার আব্বার নামে ট্রান্সফার ক'রে দিল। তারপর সে সফর করল ইন্ডিয়া। বাড়ি গিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে দেখা ক'রে এসে মা-বাপ ও উপহার-সামগ্রী সহ বোম্বাই এল। এক রাতে বিনা আড়ম্বরে নূরী-মুনীরের চির-বন্ধন কায়েম হয়ে গেল।

বহু টাকা খরচ ক'রে বহু চেষ্টার পর নতুন ভিসা লাগিয়ে মুনীর নূরীকে সঙ্গে ক'রেই সঊদিয়া ফিরে গেল। রিয়ায থেকে তাদের সমস্ত মাল-পত্র গুটিয়ে বুরাইদার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল।

মহান আল্লাহর পরীক্ষায় পড়ে মাঝে কত বাধা উল্লংঘন করতে

করতে সউদিয়ার সুসজ্জিত আলোময় কক্ষে বিলাস-পালঙ্কে বহু আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত হারিয়ে যাওয়া মানুষ ফিরে ফেল উভয়ে।

নূরী-মুনীরের আজকের রাত নূরে নূরে পরিপূর্ণ। আকাশে পূর্ণিমার নূর, ঘরে নূর, বাহিরে নূর, মনে-মনে নূর। বাদরিয়্যার মনেও নূর। নিরাশ হয়ে কেবল নূর হারিয়েছে হতভাগী মুনীরা।

ওদিকে রুম্মানা ভাইয়ের বাড়িতে থেকে ভাবীর গঞ্জনা-ভর্ৎসনা খেয়ে কালি হয়ে গিয়েছিল। গাছের অবলম্বন ছেড়ে সে বাড়ির লোকের পায়ের তলায় 'ভুঁই-লতা'র মত লুটাপুটি খাচ্ছিল। তাকে যেন সবাই থুথু দিচ্ছিল, সবাই লাথি মারছিল। ঠোঁটকাটা হওয়ার কারণেই সে ছিল সকলের চক্ষুশূল। তার উপরে সে বাড়ির একটা অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত অবহনযোগ্য বোঝা।

সউদী আরবে কী সুখেই না ছিল! কিন্তু সে সুখ ছিল খেলার মাঠে বলের মত। যখন তা পায়ের কাছে ছিল, তখন তাকে লাথি মেরেছে। আর যখন তা গড়িয়ে গেছে, তখন তার পিছনে ছুটতে লেগেছে।

সেদিন গভীর রাতে নানা দুঃখে ঘুম না এলে রুম্মানা বড় আশা নিয়ে ফোন করল মুনীরের মোবাইলে। তখন মুনীর ও নূরী জেগে জেগে ভালবাসার রোমান্টিক গান গাইছিল। করুণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো! আমি রুম্মানা বলছি। ফোন কেটে দিয়ো না, দয়া ক'রে আমার কথাটা শোন। আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রে দাও। আমাকে আবার বিদেশে নিয়ে চল। আর আমি দেশের জন্য কাঁদব না।'

সমাপ্ত